শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আটটি উপন্যাস

অশোকদেব চৌধুরী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একজন অস্তিত্ববাদী উপন্যাসকার আমাদের সামনে এসেছেন। এ লেখক কিন্তু নিজেকে কখনো 'অস্তিত্ববাদী' বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। যেমন তিনি 'জীবনযন্ত্রণা'—এই চমৎকার, বহুব্যবহারে বন্ধ্যা, বাঙালি সমালোচকের অতিপ্রিয়, বেশ লাগসই শব্দটি তাঁর গোটা ত্রিশেক উপন্যাসে বোধ হয় কখনোই ব্যবহার করেননি।

দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের গাঁটছড়া বাঁধার রীতি অবশ্য আমাদের নেই—ফরাসি সাহিত্যে যে ট্র্যাডিশন কয়েক শতাব্দীর। শ্যামল ভাবেন : মানবজীবন, এ বিশ্বজগৎ কোনো সুনিপুণ কারিকরের সৃষ্টি নয়। জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, মানুষের কাজের ভাগ্যের কোনো ব্যাখ্যা নেই। কতকগুলো ঘটনা ঘটে যায়, ঘটনাক্রমে কিছু মানুষের ভালো হয়, কিছু মানুষ ভেঙে পড়ে। জীবন বিশ্বসংসার উদ্দেশ্যহীন, বিশৃঙ্খল। শুধু মানুষের সৃষ্টিশীল প্রয়াসে এই অর্থহীন জীবন অর্থবহ হয়। উদাসীন এক বিশ্বজগতে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মানবিক মর্যাদা রাখার জন্য শেষ অবধি কয়েকটি মানুষ তাদের চিন্তা-কল্পনা-আদর্শের জন্য যুদ্ধ করে যায়। অস্তিত্ববাদীর এই অপরাজেয় জীবনতৃষ্ণা শ্যামলের রচনার প্রাণসম্পদ। এ লেখায় জীবনের অঙ্গীকার প্রতি পদে। দুঃখচেতনা প্রখর, মৃত্যুর ছায়া প্রতি প্রয়াসে, ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনি সব স্বপ্নের শেষে। তবু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষ। জীবনের প্রাণকেন্দ্রে যে এক রহস্য প্রতি স্পন্দনে কম্পমান সেই রহস্য আবিষ্কারের জন্য একটি মানুষ পাগলের মতো চেষ্টা করে চলেছে : এই হচ্ছে শ্যামলের নায়ক। এ জীবনের অর্থ কী? সবশেষে কি পরাজয়? কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে, নিয়তির পরিহাসকেও পরাজিত করে মানুষের প্রতিশ্রুতি : এই প্রত্যয় ট্রাজিক সম্পদে ধনী। শুধু যন্ত্রণা-বিষাদ-দুঃখ নয় মানবাত্মার প্রতিবাদী প্রয়াস ট্র্যাজিক সাহিত্যের অচ্ছেদ্য লক্ষণ। শ্যামলের ঈশ্বরহীন অস্থির পৃথিবী ট্র্যাজিক ঐশ্বর্যচিহ্নিত। এ পৃথিবী কিয়ের্কেগার্ড বা হাইডেগার বা ইয়সপার্স চিত্রিত ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষের নয়; শ্যামলের মানুষেরা সার্ত্রর নিরীশ্বর জগতের অধিবাসী।

লেখক তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে প্রকৃতি আর মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, গ্রামের মানুষের বিশিষ্ট মানসিকতা, তাদের সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা, তাদের জীবনতৃষ্ণার কাব্য লিখেছেন। এ পর্যায়ের লেখা অনেক সময় কাব্যের রূপ নিয়েছে—একটি তীক্ষ্ণ উৎসুক মন জীবন এবং মানুষ আবিষ্কার করছে, মায়াবী প্রকৃতির অগাধ রহস্যে তার চিত্ত উচ্চকিত। প্রকৃতি এখানে পটভূমি নয়। কাহিনির একটি কেন্দ্রচরিত্র,

মানবসম্পর্ক অনুভব-চেতনা-বিশ্বাস-জীবনযাত্রা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে; প্রকৃতির অসীম ঐশ্বর্যে এক আত্মহারা কবি যেন জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এ পৃথিবী বাঙ্ময়—বাড়িঘর, মাঠঘাট, গাছপাখি, সাপব্যাঙ, জ্যোৎস্নাভেজা ধানক্ষেত সবই জীবন্ত, সকলেই মানুষের ভাষায় কথা বলে, মানুষের দুঃখ-আনন্দ-গৌরবের তারা শরিক। এক অদৃশ্য সুতোয় এ জগতের সব কিছু বাঁধা —জ্যোৎস্নার শাদা আলো, কুবেরের জমি কেনা, বর্ষার কালো মেঘ, অনাথের চার ইঞ্চি ডায়ামিটারের পাইপ বসানো, মাঠে ইঁদুরের গর্তে ধান, খোঁড়া হৃদয়ের অযৌক্তিক আশা, হাভাতেদের ঘরে বিকেলে ভাতসেদ্ধর গন্ধ, ওয়াগনব্রেকার, বজরার গোপ্তোরোগ। ধীরে ধীরে শ্যামল শহরের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। নগরজীবনের ব্যস্ততা ঐশ্বর্য ক্লান্তি উচ্চাশা মর্যাদা তিনি আবিষ্কার করেছেন একই জীবনদর্শনের আলোতে। গ্রামকেন্দ্রিক চারটি উপন্যাস আমরা এখন আলোচনা করছি—'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন'। নিয়তি-সংসার-প্রকৃতি নিয়ে অনেক কথা তিনি বলেছেন এই প্রথম যুগের রচনায়। 'কুবেরের বিষয় আশয়' তো একটি অনবদ্য কাব্যের মতো। হয়তো এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তবু অনেক কথা বলা বাকি ছিল। সে কথা তিনি বলেছেন তাঁর নাগরিক কাহিনিতে।

কুবের সাধারণ ঘরের মফঃস্বলে পড়া ছেলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সে স্কুলে পড়েছে: তার পর দেশভাগ, প্রায় আশ্রয়হীন অবস্থায় কলকাতা আসা, বেকার জীবন, হাওড়ার এক লোহার কারখানায় কাজ নেয়া, সে কাজ ছেড়ে সওদাগরি অফিসে কেরানির কাজ। সালকেতে তিনকামরার খুপরি বাড়িতে বৃহৎ যৌথ পরিবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সে বাস করছে। কিন্তু সে শ্যালকের বাড়িতে থাকার লোক নয়। সে এক স্বপ্নের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরছে ছোটোবেলার স্কুলজীবন থেকে। আর আছে তার তীব্র উন্মাদ জীবনস্পৃহা : সব-কিছু জানার, একটা-কিছু তৈরি করার বেহিসেবী নেশা তাকে ভূতগ্রস্থের মতো তাড়া করে বেড়িয়েছে সারা জীবন। এ যুগের অস্থিরতা স্বাধীনতা সীমাহীন উচ্চাশা তার রক্তে, এ যুগের অনিশ্চয়তা বিষণ্ণতাবোধ তার প্রতি চিন্তাকোষে। আর আছে এক গভীর মানব বেদনা, তার সাফল্য উল্লাস ব্যর্থতা উচ্চাশা সব-কিছুকে ঢেকে রেখেছে। বেকার কুবেরকে ব্রজদা বোঝাচ্ছে, *"তুই একজন কনটেমপোরারী আর্টিস্ট। সত্যি কিনা বল? তুই এ যুগে বাস করছিস—যুগের সঙ্গে জড়িয়ে আছিস—তোর এভরি রাইট আছে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দেবার। কজন তোর আমার মতো সাফার করেছে বল?"* এই তীব্র দুঃখচেতনায় যুগের হলাহলে তাঁর কণ্ঠ নীল—তবু সে অস্বীকার করে হতাশা বিচ্ছিন্নতাবোধ। জীবনের

অঙ্গীকারে সে বাক্যবদ্ধ। সেই স্বপ্নের পশরা মাথায় নিয়ে চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে সে জমির সন্ধানে বেরুলো। জমি কেনাবেচা করতে করতে কলকাতার কাছে একটা আস্ত কলোনি গড়ে তুলল। এর পর এল ফসল ফলানোর পর্ব। যে বিপুল অর্থ তার হাতে এসেছিল তার সবটাই সে লগ্নি করলে বঙ্গোপসাগরের ছোটো এক দ্বীপে বোরো ধান চাষে। রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মেদনমল্লর এক হাড়গোড়ভাঙা বৃহৎ গড় এই দ্বীপে একবোঝা স্বপ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। কুবের পাগল হয়ে গেল—ছেলেমেয়ে বউ সব ভুলে গেল, সে যেন এক রূপকথার দেশে এসেছে। হাজার বিঘে ধান, ড্রিম মারচেন্ট কুবের এবার চকদার হবে। তবে এতখানি বাড়াবাড়ি প্রকৃতির সহ্য হলো না। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে এক রাতেই কুবেরের স্বপ্ন জলের তলায়—

কিছু বেশি রাতে কুবেরের ঘুম ভেঙে গেল। বাতাসের দাপাদাপি সুবিধের ঠেকছে না। সাত ব্যাটারির বন্দুকমার্কা টর্চ জ্বেলে দেখলো সদ্য সদ্য শাদা ফুলধরা ধানের শিষ ক্ষেতময় পাগলা বাতাসের সঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে। কুবেরের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সর্বনাশ। সব গেল... এই নিশুতি রাতে অচেনা দ্বীপের বুকে দাঁড়িয়ে কুবের বার বার বুঝতে পারছে—এই নদী এই মাটি—বাতাসের দাপাদাপি, ভগবানের পোকামাকড়—সব কিছুর হাতে সে শুধুই একটা পুতুল। তার শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, কোনো রাস্তা নেই।

চকদার কুবের হঠাৎ দেখল নিয়তি তার সর্বনাশটি নিঃশব্দে সম্পন্ন করেছে। সে শুধু একজন অবাস্তব অপ্রাসঙ্গিক দর্শক। *"সে শুধুই একটা পুতুল"।* সত্যিই সে কি প্রকৃতির হাতের পুতুল? না, কিছু অস্ত্র তারও হাতে আছে? *"তার শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কোনো রাস্তা নেই।"* নিয়তির স্পষ্ট উপস্থিতি মেনে নিয়েও মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কাজ করে যাওয়া—এই হচ্ছে কুবের। সব খুইয়ে কুবের কদমপুরে ফিরে এসেছে; উদভ্রান্ত অস্থির। স্নানের ঘরে গিয়ে সে তখনো গলা ছেড়ে গান গাইছে।

শ্যামলের সব ভালো লেখায় এই বৈপরীত্যের পৃথিবী উদ্ভাসিত। দুই মেরুর যুগপৎ উপস্থিতি। ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায়, নিয়তিতে বিশ্বাস আছে আবার আত্মবিশ্বাসও প্রবল। বৈপরীত্যের এই জগৎ দ্বান্দ্বিক নিয়মে এগিয়ে চলে। এই জগতের হৃদয়ে, মানুষের বুকে একটা হাহাকার আছে। এই বেদনা মানবজন্মের সঙ্গী। কিন্তু হেরে গিয়েও মানুষ হার মানে না, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিবাদী হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। শ্যামলের কথায়, *"ঘা খেয়েও লোকটা গান গায়।"* একেই কি সেই গ্রীকদের ভাষায় বলে মানুষের ট্র্যাজিক মহিমা?

কুবের সারাজীবন নিঃসঙ্গ স্বপ্নসন্ধানী হয়ে রইল। জমি কেনাবেচার ব্যবসায়ে যখন সে টাকার পাহাড় তৈরি করছে তখনো সে নিঃসঙ্গতার শিকার। তখন সে ড্রিম

মারচেন্ট। সে জমি বিক্রি করছে না, সে বিক্রি করছে স্বপ্ন। একটা কিছু গড়ে তুলছে, সেই নেশায় সে ছেলে বউ নিজের কথা ভুলে গেছে। নেশাচ্ছন্নের মতো লোকটা কাজের পাহাড় ভেঙে চলেছে, এরপরে আর একটা পাহাড়, তার পরে আরো একটা....। তবু এই নিশ্ছিদ্র কাজের মধ্যে বসে কুবের তার রক্তের মধ্যে শোনে এক নিঃসীম হাহাকার। এত জমিজমার বিলিবন্দোবস্ত হচ্ছে, বাড়িঘর তৈরির যেন মচ্ছব পড়ে গেছে। কুবের তখন ভাবে—

এই পৃথিবীতে এক একদল লোক এসে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বাগান ফুলগাছ সব বানায়। কত লোক পলেস্তারার সময় পঙ্কের কাজ করায়, ছাদের আলসেতে সিমেন্টের পরী বসায়, পুকুরঘাটে বেঞ্চ দেয়—অথচ শেষে সব একদিন রাবিশ হয়ে ঠিকেদারের লরীতে ওঠে, জঙ্গলে ঢাকা পড়ে—নতুন লোক জায়গা বদলে আর এক জায়গায় গিয়ে বসতি বানায়।

জমি কিনতে এসে নানা আগডম বাগডম কথা বলতে বলতে —

কুবেরের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এ আমি কোথায় আছি এখন। শ্যালকের বাড়িতে মা চোখে চশমা দিয়ে লাল বারান্দায় মাদুর পেতে বই পড়ে এ-সময়। বাবার সুঁড়তোলা গেঞ্জি পরা হয়ে গেছে। এবার গরম শার্ট চাপিয়ে চৌরাস্তা অব্দি হেঁটে আসবে। বুলুর তিনমাস। খোকন হয়েছিল বছর চারেক আগে। ফার্নেসে বিকেলের শিফট শুরু হয়ে গেছে। অ্যাপ্রেন্টিসরা কেউ লম্বা লোহার রড দিয়ে গলন্ত ইস্পাত ঘেঁটে দেখছে। এ আমি কোথায় আছি। ধানকাটা মাঠের হলুদ রঙ পড়ন্ত রোদের আলো বেয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে। তার মাঝখানে এক একটা তালগাছ সিধে দাঁড়ানো। দূরে দূরে এক এক পরতে এক একটা আবাদ।

লক্ষ করার মতো যে, জমিজমা নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ শ্যামল আমাদের একটা কল্পনার রাজত্বে নিয়ে গেলেন। সেখানে কুবেরের বিষয় আশয়ের কথা গৌণ, তার পরিশ্রম কাজকর্মের কোনো ঠিকানা নেই, লোকটা হঠাৎ যেন উন্মনা হয়ে এক ঝলক বাতাসের মধ্যে আমাদের এনে ফেললে। তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কথা জমাট হয়ে একটা চিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে আসছে। আর আমরা তো জানি সাহিত্যে চিত্রই বাঙ্ময়—কবি যখন কথা খুঁজে পান না তখন তিনি ছবির ভাষায় কথা বলেন। উজ্জ্বল কোলাজের মতো ঘনবুনোনের এই চিত্র, যখন বিভিন্ন স্তরের ছবি কথা হয়ে যাচ্ছে, কথা ছবির রঙ ফেরাচ্ছে। একে আমরা বলতে পারি ঘনকথন। এটি শ্যামলের বিশিষ্ট স্টাইল। তিনি অনেকগুলো ধ্বনি-চিত্র-কথা-অনুষঙ্গ পাঠকের ইন্দ্রিয়ে বম্বার্ড করে চলেন, একটা কিছু নকশা তৈরি হবে। তাতে শুধু তাঁর তখনকার বক্তব্যই নয়, একটা জীবনবোধের ঘনত্ব বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি বোঝা যাবে। সময় (Time) তখন একমুখী প্রবাহ নয়, তিন ধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, একটা রঙিন নকশা ফুটে উঠছে। বর্তমানের সৃষ্টির উন্মাদনা, অতীতের প্রাণান্তকর ব্যর্থ চেষ্টা, ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা এবং হাহাকার একটি জঙ্গম মুহূর্তের মধ্যে পুরে

ফেলে প্রায় তেলে জলে মেশাবার ধরনে ঝাঁকি দিচ্ছেন লেখক। কুবের এক লহমায় বুঝতে পারে তার আকাঙ্ক্ষা সাফল্য সবকিছুর শেষে অনিবার্য মানবজীবনের ব্যর্থতা।

লেখক সময় জিনিসটাতে খুব নেড়েচেড়ে দেখেছেন এই উপন্যাসে। অস্তিত্ববাদীর প্রথম সমস্যা তো সময়। একটি মুহূর্ত থেকে কখনো মুক্তো উঠছে, কখনও বা বিষ। *"কজন তোর আমার মত সাফার করেছে বল? কজন তোর আমার মত টাইমকে নিঙড়ে নিয়ে সেকেণ্ড মিনিট একটুও ফাঁকি না দিয়ে সব সময় ফিল করছে?"* সময়কে নিঙড়ে মুচড়ে যুগের সব রস সব জ্বালা একটা লোক নির্বিবাদে পান করছে। স্মৃতি এই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালকে কোনোরকমে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে। সালভাডর ডালির সেই বিখ্যাত ছবির মূল বা প্রতিলিপি আমরা অনেকেই দেখেছি। একটা ঘড়িকে মুচড়ে বেঁকিয়ে ত্যাড়াব্যাঁকা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সময়-স্মৃতি-অনুভব একটা ক্যানভাসে ঠেসে পোরা হয়েছে। কুবেরের আস্তে আস্তে স্মৃতিবিভ্রম হচ্ছে, ভোরবেলার কথা দুপুরে ভুলে যাচ্ছে, দুপুরের কথা রাত্রে। অতীত আর বর্তমান গুবলেট হয়ে যাচ্ছে, স্বপ্ন আর বাস্তব পাশাপাশি দৌড়চ্ছে, মাঝে মাঝে একই চেহারা নিচ্ছে। স্মৃতিবিভ্রমের জীবন্ত চিত্র দিয়েছেন শ্যামল। *"কুবের তার সারা জীবনের টাইমপিসটা নিজে নিজেই মেরামত করতে বসে—আগাগোড়া খুলে পরের পর খাপে খাপে বসিয়ে তুলতে পারছে না কিছুতেই। ফলে অনেকগুলো বছরের গাদাখানিক জিনিসপত্র জট পাকিয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।"* মেদনমল্লর দ্বীপে আবাদ করতে গিয়ে সে পরপর পুরোনো দিনের কথা মনে করতে চাইছিল। এই সব হারানো আঙটা ধরে কুবের যে-কোনো উপায়ে সব ভুলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে চায়। দূর্গের ধাপে বসে কুবের দেখছে স্মৃতিভ্রংশতার বিভীষিকা—

> এই এখন—এখনকার লোকজন, টাইম, বিপদ-আপদ, ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে নিজেকে যে কোনো উপায়ে সেপটিপিন দিয়ে গেঁথে রাখতে হবে। তাই এখনকার কোনো কাজে মাথা অব্দি ডুবে যেতে হবে, জড়িয়ে পড়তেই হবে । ... আবার সেই ভয়টা চেপে বসার মুখে, চেনাজানা সবকিছু মুছে যাওয়ার ঠিক আগে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে কুবের আকন্দ গাছটায় কোদাল বসিয়ে দিল। যে কোনো একটা একটানা খাটুনি দিয়ে এখনকার টাইমের সঙ্গে যে কোনো রকমে নিজেকে গেঁথে রাখতে হবে। নইলে সব ভুলে যাবে। আরেক কোপ বসাল।

এই অজানা ভীতি, ভবিষ্যতের দিকে শঙ্কাকুল চোখে তাকানো (স্মৃতিভ্রম যার একটা চিহ্ন), শ্যামলের স্রষ্টাহীন জগতের প্রাণস্পন্দন। এক অস্থির অনিশ্চয়তা কুবেরের জীবন সচল করে রেখেছে—এই সৃষ্টিধর্মী অনিশ্চয়তা না থাকলে ছোটো ঘরে বুলুর কপালের খয়েরী টিপ দেখেই তার দিন কাটত। কিন্তু তা তো হবার নয়, কুবের টাইম নিঙড়ে দুঃখকষ্ট ভোগের জন্যই জন্মেছে। সে তো হাওড়ার লোহার কারখানায় বসে থাকতে পারে না, ইচ্ছে অনিচ্ছেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাকে এগোতে

হবে পেছতে হবে। কুবের জানে বৃষ্টি আলো মাটির নীচের রাঙালু এ-সবই ভগবানের দান, আবার কত জিনিসপত্র একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়, ইস্পাত জল হয়ে ফোটে। মাটির গন্ধ, বিকেলের আলো তার মনের রঙ ফিরিয়ে দেয়, ধানের শিষ যখন ভারী হয়ে ওঠে আঠালো রসে তাকে ঋতুমতী মেয়ের মতো মনে হয়। এ-সব কথা সে খুব একটা ভাবেনি। জল হাওয়া বাতাসের মতো এ কথা তার রক্ত বলে দেয়। আর আছে তার চেতনায় অস্পষ্ট তীব্র মানব বেদনা। কুবেরের বাবা দেবেন্দ্রলাল জানতেন এ-কথাটা। *"তোমার এত দুঃখ কিসের কুবের?"* তার মনে অনেকের জন্য দুঃখ জমা হয়ে আছে। গাছ, পাখি, সন্ধ্যার আকাশ, আভার নিঃসঙ্গ জীবন, ব্রজদার অচরিতার্থ চেষ্টা, ছোটোবেলায় যে লোকটি গঞ্জে জামাকাপড় বিক্রি করত, মা যে পালঙ শাক বোনার জন্য জমি পায়নি জীবনে, মেদনমল্লর দ্বীপে ভাঙা দুর্গ—এ সবই তার মনে একাকিত্ব আনে। এই তো জীবন—সব দিনের শেষ রাতের অন্ধকারে। তবু এই অন্ধকারেই মানুষ হাতড়িয়ে পথ করে নিচ্ছে। কুবের সারা জীবন তাই করেছে, নিশ্চিত পরাজয় জেনেও।

এই তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ আর দুর্মর জীবনতৃষ্ণা কুবেরকে এনে ফেলেছিল দূর জনমানবহীন দ্বীপে, মেদনমল্লর গড়ে। দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে পুরোনো দিনের ছোটো ছোটো ইটবাঁধানো রাস্তা দেখে কুবের চমকে উঠল। *"এতো আমার চেনা জায়গা। ভদ্রেশ্বর, এতো আমার চেনা জায়গা। কতবার এসেছি এখানে। এই পথ ধরে কতবার ছুটে গেছি।"* কুবের আবার সেই টাইম নিয়ে দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে। যে অস্থির জীবনতৃষ্ণায় মেদনমল্ল সমুদ্র চষে ফেলত, এই রকম পেল্লায় এক দৈত্যের মতো দুর্গ গড়ত, সে তো কুবেরের সগোত্র। কুবের তার সগোত্র খুঁজে পেয়েছে। যে আবেগ, অযৌক্তিক ইচ্ছা আর প্রবল তাড়নায় সেই কম্বুকণ্ঠ অহংকারী সেনাপতি জ্বলছে, আজকের হাওড়ার কুবেরের বুকে সেই আগুন জ্বলছে—কখনো সে জমি কেনে, জমি বিক্রি করে, নগর বসায়, কখনো বা ছুটে যায় বঙ্গোপসাগরের বুকে আবাদ করবে বলে। *"কুবের দি চকদার।"* তাই কুবেরের কাছে সময়টা কোনো ফ্যাকটরই না, দুশো বছর আগে কি পরে তাতে কিছু এসে যায় না। বড় কিছু করবার উন্মাদনা মেদনমল্লর ছিল, অধুনা কুবেরের আছে। ব্যস, তারা তো আত্মার আত্মীয়। ঘড়িটা দুমড়ে মুচড়ে নিলেই তো আগেকার সময় ফিরে আসবে। তার মনে অনেক কিছু স্মৃতি হয়ে আছে। কিছু স্মৃতি সে আবার আবিষ্কারও করে—সব সৃজনশীল লোকের যা অভ্যাস। বাঁধানো দিঘি, বাঁধানো চত্বর, দুর্গের ফাটল, দেয়ালের ভাঙন, তার শোবার ঘর, কুবের সব চিনতে পেরেছে। সামনেই সমুদ্র; এই বিশাল জনমানবহীন দ্বীপ এ তো তার নিজের রাজত্ব। এ সবই তার। *"দখলে রাখুন। ধান*

আর দেখতে হবে না। অমরখন্দ হয় এই মাটিতে''—ভদ্রেশ্বরের এই কথা আচমকা কানে যেতেই কুবের সাধুখাঁ দুশো বছর আগেকার টাইম থেকে এক লহমায় ফিরে এল ভদ্রেশ্বরের টাইমে—

আর কোনো কথা কুবেরের কানে যাচ্ছিল না। ধানের ভারে সারা তল্লাট নুয়ে পড়েছে। লোকজন দেখা যায় না। কুড়িটা মোষের মাথা ঢাকা পড়ে গেছে। দিঘির পাশ দিয়ে পরীর সারি আড়ালে চলে গেছে। কুঁজি বেঁধে বেঁধে চাষীরা সংসার করছে। ব্যাপারীদের নৌকোগুলোর গলুইতে আঁকা মাছ, মানুষের চোখ, নোঙরের আঁক—সবকিছু চিকচিক করছে। এক লহমায় কুবের সাধুখাঁ আগামী শীতের চেহারাটা দেখে ফেলল।...

স্বপ্ন আর বাস্তবে মেশানো এই বহুমাত্রিক রঙিন ছবি আঁকতে শ্যামল ওস্তাদ। এমনকি মাঝে মাঝে মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয়। তীক্ষ্ণ এচিং-এর আঁচড়ে ফোটানো ছোটো ছোটো ছবি। মাঝে মাঝে কুবেবের ভুল হয়ে যাচ্ছে, কোনটা বাস্তব কোনটা স্বপ্ন। আমাদেরও। তবে আফসোস! আফসোস!! বিভূতিবাবুর ভারী ভারী প্রাচীন শব্দে তৈরি তেলরঙা ছবির পেছনে দিগন্তের বিস্তার, নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগানের ওপারে অনন্ত আকাশ, বিন্দুতে সিন্ধু দেখার ঐশী ক্ষমতা। মানুষের জগৎজীবন, বিশ্বপ্রকৃতি, এই বিশাল নভোমণ্ডল এক করে দেখার যে আশীর্বাদ ঈশ্বর দু-চারটি লোককে দান করেন, তিনি ছিলেন ঈশ্বরনির্দিষ্ট সেই স্বপ্নজনের একজন। শ্যামলের কল্পনায় বিশ্বভাবনার ইশারা আছে, ইঙ্গিত স্পষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের সমতুল্য শ্বাসরোধী ঐশ্বর্য নেই। শ্যামলের আকাশ উপুড় করা বাটির মতো, খণ্ড সীমাবদ্ধ, যদিচ উজ্জ্বল মোহময়ী, অপ্রতিরোধ্য সে আকাশের রঙ-রস-আলো ধরাছোঁয়ার মধ্যে। হাসি-কান্না অশ্রুটলোমলো বেদনায় বিচিত্র রঙ্গরসে ভরপুর শ্যামলের বহুমাত্রিক রঙিন পৃথিবী। তারই মধ্যে হাসতে হাসতে কুবের চলেছে স্বপ্নের বোঝা মাথায় নিয়ে বুড়ো সাপটার পাশ কাটিয়ে নির্জন দ্বীপে সোনার ধান ফলাবার মরীচিকা নিয়ে। লোকটাকে দেখলে ঈর্ষা হয়। এত বোঝা মাথায় নিয়ে হাসে, গান গায়?

দ্বীপে গিয়ে কুবের তার সঙ্গিনী আভাকে পেল। আভা নতুন করে কুবেরকে আবিষ্কার করছে প্রতিদিন। সে এই প্রথম একটা সুস্থির নিশ্চিত জীবনের স্বাদ পেল। কুবেরের জগৎ, তার ঐশ্বর্য সবই তার কাছে নতুন। কুবেরের জীবনে প্রেম যৌনতা এগুলো বড়ো কথা নয়। এ আবেগ তার আছে, তার মা বাবা ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা তার চেয়েও বড়, আরও গভীরে আছে আত্মআবিষ্কারের নেশা, গড়ার নেশা। কুবেরের কাছে যৌনসম্পর্ক বা যৌনস্পৃহা বড় কথা নয়। তার জীবনে মেয়েরা এসেছে, জড়িয়ে পড়েছে, চলে গেছে, কোনো সাংঘাতিক স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারেনি। সুস্থির জীবনের স্বাদ সে কখনো চায়নি। তাকে তাড়া করেছে এবটা

কিছু তৈরির নেশা। আর তাকে নিরন্তর অনুসরণ করেছে মৃত্যু—সব কাজের শেষে যা অপ্রতিরোধ্য। কুবেরের শেষ সময়ের বর্ণনা তো অপূর্ব। সাপের বিষে কুবের তখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু কোনো দুঃখবোধ কষ্টবোধ তার নেই। বাস্তব আর স্বপ্নে একাকার। চন্দ্রাহত শেষ মুহূর্তে কুবের আবিষ্কার করল আভা যা বলেছিল তাই ঠিক—চাঁদ কিন্তু হলদে নয়, নীল, অথচ এতবড়ো আবিষ্কার চেঁচিয়েও বলা যাচ্ছে না। মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা রেখে কুবের চাঁদ পেয়ে গেল—

হাতের একটা আঙুল চাঁদের এক কোণে লাগাতেই ডেবে গেল। আভা ঠিক বলেছিল। খুব সাবধানে আর এক কাঠি উঠে কুবের ডান হাতখানা চাঁদের ওপর চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে কনুই অব্দি গেঁথে গেল। অনেক কষ্টে টাল সামলে নিল কুবের। এত বড় একটা জিনিস। তার সবটা জুড়েই নীল মাখনের কোটিং। তার ওপর দিয়ে নীলচে আলো গলে গলে পড়ছে। এখান থেকেই জ্যোৎস্না হয়। এই হলো গিয়ে অরিজিন। মাখনের নীচে ডান হাত দিয়ে কুবের চাঁদের গায়ের শক্ত কিছু ধরতে চাইল।

নিশ্চিন্দিপুরের সর্বজয়ার মৃত্যুর বর্ণনাও অপূর্ব। কিন্তু তার আড়ালে ডিমি ডিমি দুন্দুভি বাজে, কালের মন্দিরার আওয়াজ পাই কান পাতলে। কুবেরের কাছে মৃত্যু আসে ফুরফুরে জ্যোৎস্নার ওড়না গায়ে দিয়ে, তার নূপুরের রিনি-রিনি শব্দে আমাদের ভয় হয় না। বন্ধুত্বের প্রেমের নেশার হাতছানি। শেষ অবধি কুবেরের খেদ রইল, আবিষ্কারের কথাটা কাউকে বলা হলো না। বরাবরই সে জিজ্ঞাসা করে গেল, আত্মআবিষ্কারের নেশায় মশগুল হয়ে রইল।

মনে হয় শ্যামল জীবনে একটা উপন্যাসই লিখেছেন। মফঃস্বল থেকে আসা শহরবাসী কুবেরকে এনে ফেলেছেন নানারকম পোশাক পরিয়ে তাঁর পরের সব উপন্যাসে। কখনো তিনি অনাথ বসু নামে ঈশ্বরীতলায় বাড়ি তৈরি করেন, চাষবাসে লেগে যান, কখনো বা তিনি দিলীপ বসু নামে খাদানে নামেন একটা বড় কিছু গড়ার জন্য। কিন্তু আমরা জানি শ্যামল কদমপুর ছেড়ে যাননি, কুবেরের মুখটা মাঝে মাঝে পালটে যায় মাত্র। জায়গাগুলোর নামও। চেনা যায় সেই একই পরিবেশ, সেই একই জীবনসংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি।

আর আছে ভাষাকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার প্রতিভা, নিয়ম-অনিয়মের তোয়াক্কা না করে আচমকা একটা নতুন বিষয় এনে ফেলার দুঃসাহস। এই জীবনচতুর দৃষ্টিভঙ্গি, সরস বুদ্ধিদীপ্ত মাধুর্য তাঁর স্টাইলের প্রাণবস্তু। তদ্ভব শব্দ শ্যামল সযত্নে পরিহার করেন, উজ্জ্বল চলতি দু-একটি বিশেষণে, অপ্রত্যাশিত লাগসই একটি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, কাটা কাটা বাক্য গঠনের ধারে আমাদের মন উত্তেজিত করে তোলেন। শ্যামলের জীবনদর্শনে এমন-কি শব্দপ্রয়োগেও বিপরীত মেরুর চিন্তা-কল্পনা সর্বদাই সক্রিয়। আনন্দ-বিষাদ, বিজয়োল্লাস-বিষণ্ণতা, প্রাভাতিক

দীপ্ত সূর্যালোক এবং আপরাহ্নিক রঙের শেষ উৎসব তাঁর দৃষ্টিতে একই শরীরে মিশে গেছে। বৈপরীত্যের এই দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান, বাংলা উপন্যাসের অঙ্গনে অপরিচিতপ্রায়। যে ঈশ্বরবাদী বিষণ্ণচেতনায় শীর্ষেন্দুর জগৎ আশ্লিষ্ট, তাতে এই অপরাজেয় জীবনাদর্শের মাত্রা নেই, সুনীলের প্রতিভা যে তীক্ষ্ণ সমকালীন চেতনায় উত্তেজিত তাতে কিন্তু একটি বিশ্বদৃষ্টির কেন্দ্রাভিগতা অনুপস্থিত। প্রধানত এঁদের শিল্পকার্য বিবরণধর্মী—কাহিনি বা ঘটনার গ্রন্থিবদ্ধ পারম্পরীণ রচনায় বা একটি মোহময় পরিবেশ গঠনে এঁদের কুশলী লেখনী সার্থক; কিন্তু এ সৃষ্টিতে বিশ্লেষণের স্থান স্বল্প, পাঠককে খুব একটা ভাবতে হয় না। শিক্ষিত হাতের সুন্দর শব্দচয়ন, প্রায় চিন্তাহীন অভ্যাসধন্য বাক্যগঠন, তাঁদের স্টাইল কাহিনির প্রাণসম্পদ। শীর্ষেন্দুর একান্ত নিজস্ব জগতে সংঘাতের স্থান স্বল্প; মৃত্যু, দৈব এবং ঈশ্বরীয় অনুজ্ঞা যে জগতের আলফা এবং ওমেগা সে জগতে তো সংঘাতের স্থান নেই; কারণ সংঘাত একান্ত জীবনসম্পৃক্ত। মানুষের স্বার্থ বিশ্বাস লোভ আশা এ-সব আশ্রয় করেই নাটকে উপন্যাসে সংঘাত গড়ে ওঠে। জীবন সম্পর্কে প্রথম রাউন্ডেই যদি শেষ কথা জানা হয়ে থাকে তবে তার নশ্বরতা বিষাদ এ-সব নিয়ে কাব্যিক ভাষায় একটা গল্পের কাঠামোতে সুন্দর আবহসংগীত রচনা করা যায়। এ সৃষ্টির নিশ্চয় নিজস্ব জগৎ আছে। শীর্ষেন্দুর জগৎ তাই স্থাণু, বিষাদপ্রতিম এবং বৈচিত্রবিহীন। ঠিক যেমন সুনীলের উপন্যাসে বর্ণনার জাদু আছে, বৈচিত্র্যের চমক আছে এক-একটি ঘটনা গড়ার নির্মাণকৌশলে, মন উত্তেজিত থাকে কাহিনির গতিতে, আকর্ষণ শেষ অবধি টান টান থাকে গল্পের পরিণতি জানার জন্য। সুনীলের সৃষ্টিতে বিশ্লেষণের ধার আছে, কিন্তু জীবন এবং জগৎকে জানার যে অনুসন্ধিৎসা থাকলে একজন লেখক সমকালীন বাস্তবতার পরের ধাপে পৌঁছতে পারেন—তাঁর একটা নিজের জগৎ তৈরি করতে পারেন, সুনীলের প্রতিভায় সেই অনুসন্ধিৎসা নেই।

শ্যামল কখনো মাটিকে ভোলেননি। জমি ধান গোরু বৃষ্টি ফসল মানুষ এরা সব এক সুতোয় বাঁধা। এদের রহস্য এদের জীবন নিয়ে তাঁর কৌতূহল, জিজ্ঞাসার শেষ নেই। গাইগোরু জমি বাড়ি, এই সব নিয়ে কুবের জড়িয়ে পড়লো ঈশ্বরীতলায় অনাথ বসু নামে। মোটামুটি তার জীবন মন্দ কাটছিল না। শিয়ালদা থেকে পৌনে এক ঘন্টা লাগে এই ঈশ্বরীতলায় আসতে। মফঃস্বল জনপদ, শহর আর গাঁয়ে মেশামিশি, আজকাল যেমন হয়। অনাথবন্ধু সেখানে কোটাবাড়ি তৈরি করেছে। স্ত্রী, দুটি কন্যা আর একপাল জীবজন্তু নিয়ে তার গুছোনো পৃথিবী। এমন সুখের সংসারে তার কোনো চিন্তা থাকা উচিত নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তার মাথার পোকা মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে, তখন সে জ্যোৎস্নার ভেতর বিকেলের আলো দেখতে পায়।

কলকাতা থেকে বেলাবেলি বাড়ি ফিরে অনাথ দেখে ঈশ্বরীতলা অন্যরকম হয়ে গেছে। একেবারে আদিম পৃথিবী। আবার অশোকতরুর রেকর্ডে জ্যোৎস্নারাতে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে তার মনে হয় গানের জোরে জ্যোৎস্নার মানে বেরিয়ে আসছে। *"এখন ঈশ্বরীতলা গ্লোবের বাইরে। দূরে জ্যোৎস্নার ভেতরে একটা লাল দগদগে আগুনের ফুলকি। ডিসস্ট্যান্ট সিগন্যালের ওই স্মৃতিটাই শুধু পৃথিবীর সঙ্গে এখন ঈশ্বরীতলার একমাত্র যোগ।"* এমন আড়বুঝো লোক শ্যালকের ভাড়া বাড়িতে থাকতে পারে না। কদমপুরের অত বড়ো ফলোয়া বাড়িতেও সে চাঁদের নীল রঙ আবিষ্কার করেছিল। ঈশ্বরীতলায় তিনঘরের পাকা বাড়িতে বসে সে জানল ডিসস্ট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটাই শুধু পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র। বাকিটা তো বুনোপরীদের ওড়বার জায়গা।

এই ঈশ্বরীতলায় থাকতে থাকতে অনাথ অনেক জিনিস দেখেছে, কলকাতায় থাকতে তার চোখই ছিল না এ-সব দেখার—মেঘের রঙ, বাঁওড়ের জল, বর্ষায় ঘন কালো হয়ে ওঠা বাঁশের ঝাড়। বাতাসের গা থেকে বাতাসের খোসা তুলে আস্ত জিনিস অনাথ এখন দেখতে পায়। এইরকম যখন অবস্থা সেইসময় তার দেখা হলো বাজিকরের সঙ্গে। গায়ে কালো আলখাল্লা, চোখে সুরমা টানা, পায়ে লাল কেডস, কাঁধে বাঁকা লাঠিতে পুঁটলি ঝোলানো, গল্পের একটি জ্যান্ত দরবেশ বললেই হয়। সে একদিন অনাথের মাথার মধ্যে একটি পোকা বসিয়ে দিল—

আপনি আমার চেয়ে অনেক পরে দুনিয়ায় এসেছেন। এখনো আপনার সময় আছে। আপনার নিজের কোনো জিনিষ তৈরি করতে ইচ্ছে করে না?

এই হলো আরম্ভ। শুধু বাতাসের রঙ দেখা নয়, আলোর শব্দ শোনা নয়। তা হলে এখানে নিজেও কিছু করা যায়? একটা কিছু তৈরি করা যায়? অনাথ লেগে গেল। প্রথমে ভেবেছিল নিজের বিঘে চারেক জামিতে চাষ আরম্ভ করবে। কিন্তু সে দেখল, বর্ষার চাষের পর জলের অভাবে কোম্পানি বাঁধের গায়ে তিনশো বিঘে জমি পতিত পড়ে থাকে। অনাথ চাষীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বোঝাতে লাগল খালের জলে বড়ো পাম্প বসিয়ে একজোটে চাষ করতে হবে। নানা জায়গায় মিটিং এই নিয়ে। ঈশ্বরীতলার লোক জানল একটা এলাহি কর্মকাণ্ড আরম্ভ হচ্ছে। সে নিজে জামিন হয়ে ব্যাঙ্ক থেকে মোটা সুদে অনেক টাকা ধার নিয়েছে, সেই টাকায় ইলেকট্রিক পাম্প, বীজখানা, বীজ ছড়াবার মেসিন এসেছে। ধান প্রতি মুহূর্তে বিন বিন করে বাড়ছে, সাড়ে তিনশো বিঘের জমিতে জল থাকা চাই। একদিন বাইরের বারান্দায় বসে একটা ধানগোছের ভিতর মাঝের পাতা নখ দিয়ে চিরে ফেলে অনাথের মাথা ঘুরে গেল। যে পাতাই চিরে ফেলে তার মধ্যে মাংসল এক একটি পোকা। ধানের মৃত্যুবান প্রকৃতি পাঠিয়েছে অনাথকে সামলাবার জন্যে। রসস্থ গর্ভথোড়ের ভেতরেও

সেই একই ক্রিমি। মাজরা পোকা। ভোরবেলার রোদেভাসা ঘনসবুজ ধানচারার মাঠে গিয়ে বুঝল এটি মায়া, এই ক্রিমিটাই বাস্তব সত্যি। স্বাস্থ্যবান পুষ্ট ধানচারার যেখানেই হাত দেয় সেখান থেকে শ্বেত প্রজাপতির দল উড়ে যায়। এরাই এই ক্রিমিদের জননী। থোড়টুকু এই ক্রিমিরা চুষে খায়, যা পড়ে থাকে তা হলো মরা শীষ। চিটে। শেষে থাকে শুধু খড়। সব শুনে বাজিকর বলে, প্রকৃতি তার বাণ পাঠিয়েছে। আগে থেকে সাবধান হননি। মাঠের রূপেই ভুলে ছিলেন। মহামায়া ওভাবেই তো ভোলায়। বিপদ কখনো একলা আসে না। পাম্প দিয়ে জল আসছে না। এ ক'মাস জল না হলে তো চলবে না। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে চার ইঞ্চি ডায়ামিটারের পাইপ এসে গেল দশখানা, দুশো ফুট নীচে পাঠানো হলো সেই পাইপ। বাড়ি জমি সব বাঁধা রইল ব্যাঙ্কের দরজায়। কিন্তু জল সরু ধারায়, তাতে কাজ হবে না। শেষে বড় ডোবার জল এনে মাঠে দেয়া হলো। ধান হলো বটে, সবই পোকায় খাওয়া। এত বড়ো মাঠ কঙ্কালের মতো বসে রইল অনাথের চোখের সামনে। ভরাডুবি একেই বলে। কিন্তু ঈশ্বরীতলার মানুষ জানে ধান কাটা হচ্ছে, ব্যাঙ্ক জানে অনাথবাবু আসছে বছর ছোটো ট্র্যাকটর দিয়ে জমি মাড়াবে। শুধু অনাথ সারা রাত বারান্দায় পায়চারি করে। কিন্তু আরো কিছু বাকি ছিল। এবার এল আকাশবন্যা, বিদ্যাধরীর বাঁধ ভেঙে গেল। অনাথের হাঁস মুরগি সব ভেসে গেল জলে। জল সরে গেল, পড়ে রইল মাঠের কবরখানা—সেখানে শ্যামলের স্বপ্নকে জোর করে গোর দেওয়া হয়েছে। একাত্তর হাজার টাকা দেনা রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে। সে বউ মেয়ে নিয়ে মর্টগেজ দেয়া বাড়ি আঁকড়ে রয়েছে, অথচ বাইরে এত বড়ো আকাশ, খোলা মাঠ। চেয়ে দেখল বর্ষার আগের বন্নের শাকে মাঠ ভরা, ডাক ফড়িং লাফাচ্ছে। অনাথ ভাবে সে কি ভুল করেছে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে নেবে পড়ে? বন্যাতে যখন মাঠের কাটা খড়ের পাহাড় গোবর হয়ে গেল তখনো সে তো পিছ-পা হয়নি। পোকায় খাওয়া ধান উঠবে জেনেও বাড়ি বন্ধক দিয়ে বড়ো মাপের পাইপ এনেছে মাঠে জল দেবে বলে। সে তো পিছ-পা হয়নি। অনাথ যদি তখন আত্মহত্যা করত তা হলে কোনো দেনা তাকে ছুঁতে পারত না—

এখন আসলে তার বেরিয়ে আসার উপায় নেই। লোকসান জেনেও তাকে পুরোপুরি সব করে যেতে হবে। হেরে যেতেই হবে আগাম জেনেও দৌড় থামাবার উপায় নেই। এখন এই মাঠবোঝাই ধানের গোছ আসলে খড়। ভবিষ্যতের খড়।

আসলে শেষ অবধি থাকে কি? থাকে তো এই মানুষটা। এই আমি। আমার দেখা। আমার তেষ্টা। আমার কষ্ট। আমার সুখ।

এই হচ্ছে অস্তিত্ববাদীর শেষ কথা : হেরে যেতেই হবে আগাম জেনেও দৌড় থামাবার উপায় নেই ... শেষ অবধি থাকে তো মানুষটা। কুবেরের জগতে মফঃস্বলের

বাংলা আর বহুদূরের এক দ্বীপজীবনের কথা আছে। স্বপ্নের আমেজ সারা গল্পটার শরীরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। দুশো পৃষ্ঠার 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'য় শ্যামল স্বাধীনতাউত্তর গ্রামের অনেক কথা বলেছেন কাহিনি আর ঘটনার স্তরে। গভীর কোনো চরিত্রচিত্রণে বা কাহিনির আত্মিক তাৎপর্য উদঘাটনের স্পর্ধায় তিনি অনিচ্ছুক। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, হয়তো এবার বাস্তবের বেড়া ডিঙিয়ে শ্যামল ঝাঁপ দিলেন বড়ো জলে, দু-একটি মুক্তাবিন্দু উপহার দেবেন আমাদের। কিন্তু প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। আভাস দিয়েছেন একটা বড়ো জগতের। তার পরেই কিন্তু মৃদু হেসে ফিরে এসেছেন ঈশ্বরীতলায় বা কদমপুরে। মফঃস্বলের পথঘাট, মজা নদী, জ্যোৎস্নাবেঁধা মাঠ, ব্যাঙ্ক, ভোট সব মিলিয়ে 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' একখানা নকশী কাঁথা বললেই হয়।

মফঃস্বলের জীবন, তার রূপ রস গন্ধ শ্যামলকে যেন কবজা করে ফেলেছে। এ পৃথিবীতে তিনি খুব স্বচ্ছন্দ। প্রায় মাছের মতো চেনা জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছেন। 'স্বর্গের আগের স্টেশন' আর 'চন্দনেশ্বর জংশন' একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে। কদমপুর গ্রাম ফিরে এসেছে দক্ষিণমালঞ্চ নাম নিয়ে, অনাথের নাম হয়েছে খগেন বা বিজন 'স্বর্গের আগে স্টেশন' উপন্যাসে। এ কাহিনি গড়ে উঠেছে নিরক্ষর খগেন নস্করকে কেন্দ্র করে। সে জীবনের মানে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে। তার জগৎ সর্পময়, সে সাপেদের ভাষা বোঝে, সাপেদের চালচলন জানে, এক সর্পিনীর আসঙ্গ-লিপ্সা তার অচেতন মনে। সে শেকড়বাকড়ের গুণ জানে, বাতাসের আলো দেখতে পায়, পাখি-ধানক্ষেত-গাছ তার সুখদুঃখের সাথী। সেই লোকটি লোভে পড়ে গোসাপ ধরতে লাগল, সাপ ধরে তার বিষ বার করে ভদ্রলোক বিপিনবাবুর কারবারে লেগে গেল। গল্প জমে উঠল যখন সে মদ্দা কেউটেকে ধরে মেছলায় বন্দী করে আর মাদি কেউটেটা তার পেছন পেছন ঘোরে কখন তাকে শেষ করবে। তার চোখের তাপ সকালে দুপুরে বাঁওড়ে খগেন হঠাৎ হঠাৎ টের পায়। সাপ নিয়ে শ্যামলের এক অবসেশন আছে। কুবের সাপের কামড়ে শেষ হয়, বাজিকর আর অনাথ সাপ নিয়ে আলোচনা করেছে। আর এই আশ্চর্য কাহিনি তো সর্পময়। সর্পিনী এক বিশিষ্ট চরিত্র, এমন-কি কলেজে-পড়া শিবানী যার সঙ্গে খগেন শঙ্খ হয় তাকেও মাঝে মাঝে সর্পিনী বলে ভুল হয়। সাপেদের হাবভাব, তাদের চেনাঅচেনা ভালোবাসা, আহার-সন্ধানের সময়, তাদের আলস্য ক্ষুধা হিংসা সব মিলিয়ে এ একখানি সর্পপুরাণ বললেই হয়। কুবের বা অনাথের জগৎ ভদ্রলোকের জগৎ। তাদের চাওয়া-পাওয়া বিশ্বাস-সন্দেহ ভদ্রলোকের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তবে তাদের মানসিক গঠন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নয়, অনেক ঝুঁকি নিতে পারে, কবজা অনেক শক্ত। খগেনের জগৎ হেলেচাষীর জগৎ। এ পৃথিবীগ্রামের বাউণ্ডুলে আধপাগলা অথচ সম্ভ্রমউদ্রেককারী

লোকজনের। দুবেলা ভাত জোটে না, ছেলেপিলে মাঠে মাঠে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বের করে সন্ধেতে এসে ভাত চাপায়, গ্রামের হাভাতেরা ভদ্রলোকের বাড়িতে চুরি করে—এদের জীবনযাত্রা মানসিকতায় শ্যামল যেন আমাদের আবিষ্ট করে তোলেন। পড়তে পড়তে কখন যে আমরা খগেন, শিবানী, বিপিন, চোর হাজরা, রেলের ওয়াগনভাঙা বজরার জগতের বাসিন্দা হয়ে যাই মনেও থাকে না। এ জগতে ধম্মের ষাঁড় জোছনায় দাঁড়িয়ে চান করে, মেছুনি কেউটে ফণা নাচিয়ে খগেনকে ডাকে, বাচ্চা বেজিরা হাসতে হাসতে লাফ খায়।

বিভূতিবাবুর গ্রামের ছবি—ষাট বছর আগের গ্রাম, হাড়গুঁড়োকরা দারিদ্র্য, প্রকৃতির মোহাঞ্জন মানুষের আত্মিক সম্পদ। সে জগৎ গ্রামের নিম্নবিত্ত ভদ্দরলোকের জগৎ, গ্রামের পূজাপার্বণের বাজনা শোনা যায় সে গল্পে, ধুনোগুগগুলের গন্ধ পাতায় পাতায়। নিরক্ষর ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠে ধনী সে পৃথিবী। তারাশঙ্করের গ্রাম আলাদা—সেখানে অদৃশ্য এক মন্দিরা ডিমি ডিমি তালে বেজে চলেছে অগ্নিগর্ভ এক ভবিষ্যতের আরাধনায়। অচিন্ত্য গ্রামবাংলার অনেক ছবি উপহার দিয়েছেন আমাদের তাঁর ছোটগল্পের ডালিতে। তবে শহুরে লোক, ধারালো ভাষায় লিখেছেন; ভালো সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিভূতি বা তারাশঙ্করকে যে অর্থে গ্রামের একজন বলা যায় শ্যামল হাড়েমাসে তাই।

চন্দনেশ্বর মৌজার উল্লেখ ছিল 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'য়। সাপুড়ে খগেন নস্করের ছেলে ওয়াগনব্রেকার বজরা 'চন্দনেশ্বর জংশন' উপন্যাসের নায়ক। ফলে এই উপন্যাস ক'টায় একটা অদৃশ্য সুতো বোনা রয়েছে। টানলেই বেশ ক'টা ঘটনা, চরিত্র সামনে এসে কথা বলে। বজরার ভাই রিদে (হৃদয় নস্কর) একটু হাবাগোবা নির্বিরোধী ভাগচাষী, ধেনোজমি পটলক্ষেত তার জীবন, খাটুনি আন্দাজে পয়সা জোটে না, তেল আনতে পানতা ফুরোয়। তবু তার ভালো হবার সাধ যায় না। সে তার বাবা মাদি-কেউটের কামড়ে মরা গুণীন খগেন নস্করের মতো। হৃদয় নস্কর জানে যত খারাপ সময়ই হোক এর পরে ভালো সময় আসবে। ছোট্ট এই উপন্যাসে বন্ধকী করবার, ভাগচাষ, খুন ডাকাতি, ওয়াগনব্রেকিং, পুলিস দারোগা ভয়ানক সব বাস্তব ব্যাপার। এরই মধ্যে বাস ক'রে ওয়াগনব্রেকার বজরা মজা নদীর ধারে বড়ো বড়ো পাথরের ঢিবির কাছে জ্যোৎস্না রাত্রে পরামর্শ চায়। ছোটোবেলায় গোরু চরাতে এসে এই পাথরগুলো তার আত্মীয় হয়ে গেছে। তারা বজরার জীবনে প্রায় বিবেকের রোল নিয়েছে—

আমি কি সৎ হতি পারি?

খুব হওয়া যায়। কেন যাবে না?

রিদয় নস্কর কি কোনোদিন উঠে দাঁড়াতি পারবে?

খুব পারবে বজরা। খুব পারবে। তাড়দায় যে ঘরে আগুন দিলে সে ঘর কি ফিরে ছাওয়া হয় নি? কোনো কাজ বন্ধ থাকে না।

"কোনো কাজ বন্ধ থাকে না"—পৃথিবী এগিয়ে চলে। এইটেই শ্যামলের পৃথিবীর মোদ্দাকথা। রিদয় নস্কর রেল পুলিসের বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতাল থেকে দু'মাস পরে ফিরে এসেছে—হাঁটতে পারে না, না ধরে দাঁড়াতে পারে না, বউটা পরের বাড়ি ঝিবিত্তি করে, ছেলেগুলো মাঠে মাঠে ধান কুড়িয়ে মরে, বিকেলের দিকে বজরার বউ সনেকা বড়ো বড়ো তিনটে বুনো কাঁকরোল হাতে ফেরে। তালগাছ সুপুরিগাছ জিওলগাছ ধরে এ-মাঠে সে-মাঠে রিদয় ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে হাঁটে। লোকে বুঝে পায় না ঘরে ভাত নেই, কাপড় নেই, হৃদয় নস্করের বুকে এত সাহস কোথা থেকে আসে। বউ জিগেস করে এই অবস্থায় নেঙড়ে নেঙড়ে বড় বড় মাঠ ভাঙা কেন? শুধু পটলক্ষেত দেখার জন্যি? অন্য কথা আছে—

অন্য আর কি বউ। এই মাঠটা পেরোলেই যে আকাশখানা পড়ে—তাতে সন্ধে সন্ধে চিত্তিরবিত্তির রঙ ফোটে। মনে নেয়—সামনে বুঝি কোনো ভাল দিন আসবে। এগিয়ে গে সেটা দেখি।

দারিদ্র্য পরাজয় মৃত্যুর মধ্যেও আশার বীজ, *"ভালো সময়ের গায়ে হৃদয় নস্কর সব সময় বাসন্তী রঙ দেখতে পায়।"* এই আশাবাদী অপরাজিত জীবনচেতনা শ্যামলের পৃথিবীকে গর্ভবতী করেছে। বজরা আর রিদয়ের গল্পের সঙ্গে জট পাকানো হয়েছে আর-একটা গল্পের। অনন্ত বাঁড়ুজ্যে আর তার স্ত্রী প্রভাবতীর জীবনে বিভূতি বাঁড়ুজ্যের পুরনো বাড়ির গন্ধ আছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় দারিদ্র্যের কঙ্কাল ঢাকা পড়ে, শুধু থাকে মোহময়ী নেবুফুলের গন্ধ। সে গন্ধও আশাবাদী। তবে শ্যামলের গ্রাম বিভূতিবাবুর পাঁচালীর চেয়ে জটিল জীবনের আয়না। সময় তো অনেক এগিয়ে গেছে। গ্রাম হয়েছে গল্প, কেউ বাসের কারবার করছে, কোনো হাতে উঠেছে পাইপ গান—এখানে হাড়গুঁড়োকরা অসহায় দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো স্বপ্নাক্রান্ত বালকের সেই তুলনাহীন কল্পলোক কী করে গড়ে উঠবে? তবু, আধুনিক গ্রামজীবনের জ্যান্ত ছবি এঁকেছেন লেখক, আর সে জীবনে যে একটা আকাশ আছে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। ভাত জোটে না, উদয়াস্ত পরিশ্রম, বঞ্চনা, অপমান, সাপের কামড়, মৃত্যু : তবু তারা বাতাসে আশার গন্ধ পায়: ভালো দিন, সুখের বাতাস আসছে।

দুই

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জগৎ দুটো। একটা জগৎ—যেটি বোধহয় বিশিষ্টতর—গ্রাম-কেন্দ্রিক। আর একটা জগৎ যা তিনি গড়েছেন একটু পরের পর্যায়ে—শহরের

জীবন নিয়ে। প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ফসল 'কুবেরের বিষয় আশয়'। এক অপরাজেয় জীবনতৃষ্ণা এই উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে। উদাসীন ঈশ্বরহীন বিশ্বপ্রকৃতি, অজানা এক ভবিষ্যৎ, পরাজয় প্রায় নিশ্চিত, তবু সংগ্রামের কঠিন অঙ্গীকার : শ্যামলের পৃথিবী এই ট্র্যাজিক ঐশ্বর্যে চিহ্নিত। আর আছে প্রকৃতিপ্রেম যা অনেক সময় বিভূতিভূষণের কথা মনে করায়। তবে শ্যামল অনেক বেশি জীবনচতুর, ফিটফাট, আত্মসচেতন। বিভূতিবাবুর অনন্ত বিশ্বভাবনার আভাস মাত্র পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। শ্যামলের গ্রামকেন্দ্রিক সব কটি উপন্যাসে প্রকৃতি শুধু পটভূমি নয়, একটি বিশেষ চরিত্র যা অন্য মানব-মানবীর চিন্তা-চেষ্টা-চেতনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করছে। এখানে প্রকৃতি বাঙ্ময়—মাঠঘাট থেকে পাথর সাপ ব্যাঙ ধানক্ষেত সবই চেনা ভাষায় কথা বলে, তারা মানুষের আত্মার আত্মীয়। শুকনো মাঠ, ভাতসেদ্ধর গন্ধ, ইলেকট্রিক পাম্পে জল তোলা, বাঁওড়ের কালো জল, অশোকতরুর রবীন্দ্রসংগীত—সবই একটা অখণ্ড চেনা জগতের অংশ। শ্যামলের দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টিতে শহরের ইতিবৃত্ত। সেখানে প্রকৃতিপ্রীতির স্থান স্বল্প, তবু শহরের দ্রুত ব্যস্ত পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রকৃতিকেও শ্যামল জড়িয়ে ফেলেছেন একটি বিশিষ্ট ঘরানায়। নাগরিক জীবনের উন্মাদনা আর তীব্রতার মধ্যেও গ্রামীণ মানবিক সম্পর্কের কথা তিনি ভুলতে পারেন না। গ্রামজীবনের ভাষ্য লেখার সময় তাঁর প্রধান সহায় ছিল আবেগ অনুভূত মানববেদনাবোধ, প্রকৃতিপ্রেম। কিন্তু শহরজীবনের কাহিনি রচনায় বিশ্লেষণের স্থান সর্বাগ্রে—বিশ্লেষণী প্রতিভার অধিকারী না হলে নাগরিক কাহিনি সার্থক হবে না। শ্যামলের প্রতিভা ইনটেলেকট নির্ভর নয়। বিশ্লেষণের চেয়ে সংশ্লেষণে তাঁর উল্লাস। এই একই কারণে নগরজীবন নিয়ে যখন বিভূতিবাবু কলম ধরেছেন সে লেখা অনেকাংশে অসার্থক। অথচ পথের পাঁচালি বা আরণ্যক তো দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সৃষ্টি।

নগরজীবনের কাহিনি নিয়ে এখানে আমরা চারটি উপন্যাস আলোচনা করছি : 'নির্বান্ধব', 'স্বর্গের পাশের বাড়ি', 'অদ্য শেষ রজনী', 'হাওয়াগাড়ি'। 'কুবেরের বিষয় আশয়' যেমন প্রথম পর্বের সেরা ফল, 'হাওয়া গাড়ি' সেই অর্থে নগরজীবনের বিশিষ্ট প্রতিবিম্ব। যে বিশেষ বিশ্বভাবনা আগের কাহিনিকে উজ্জ্বল করেছে, এখানেও সেই একই বিগ্রহী চেতনা : কিন্তু ফলশ্রুতি (বিশেষ করে 'হাওয়াগাড়ি'তে) এক পরাজিত জীবনের আলোকহীন উপসংহার। এ কাহিনির শেষে আশার ক্ষীণ শিখাও কম্পমান। যে উজ্জ্বল আশাবাদী প্রত্যয় নিয়ে শ্যামল কলম ধরেছিলেন ক্রমশ তা জীবনের জটিল অরণ্যে হারিয়ে যাবার মুখে। অবশেষে একটা বৃহৎ অবিশ্বাসের জগতে তিনি আমাদের এনে ফেললেন। বিশ্বাসের জগৎ ক্রমশ ক্ষয় হয়ে এসেছে।

তাঁর নাগরিকজীবনের চিত্রে সেই স্বতঃস্ফূর্ত স্নিগ্ধহরিৎ আভা নেই, আকাশ সীসের মতো ভারি কালো, অবিশ্বাস আর আশ্বাসহীনতা এই উপাখ্যানের মর্মে : বন্ধু বন্ধুকে শেষ করে দেয়, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, পেটে অন্যের সন্তান তবু স্বামী তাকে ফিরে পেতে চেয়ে পথের কুকুরের মতো বিতাড়িত হয়, বিপ্লবী পুত্র স্নেহময় কিন্তু পার্টি আদালতে সাব্যস্ত প্রতিবিপ্লবী পিতার লাশ অন্ধকারে ফেলে সুস্থ বিপ্লবী সমাজ গঠনের কাজে চলে যায় ... এই আবহাওয়া হাল্কা জলরঙে আঁকা সম্ভব নয়, ভারি গম্ভীর অনুজ্জ্বল তেলরঙের ছবি এসব। এখানে শ্যামল অত্যন্ত ধনী কিংবা মোটরআরোহী চাকরীজীবী সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। মাঝে মাঝে লুম্পেন, মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলেদের জীবন দেখিয়েছেন।

খণ্ডিত বাংলায় শহর তো একটিই আছে। কলকাতা বাদে সব শহরই মফঃস্বল শহর। শ্যামলের নাগরিক কাহিনি তাই কলকাতার কাহিনি। কলকাতায় জীবনের ঐশ্বর্য ক্লান্তি অবসাদ কর্মদক্ষতা মর্যাদা তিনি আবিষ্কার করছেন।

বালজাকের উপন্যাসের মতো বেশ কিছু চরিত্র একই নামে বা ভিন্ন নামে সময়ের বেড়া হেলায় তুচ্ছ করে গ্রাম ছেড়ে শহরে ঢুকে পড়েছে। গ্রাম ছেড়ে কুবের ছদ্মবেশে নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতায় এসে 'হাওয়াগাড়ি'র দিলীপ বসু হয়েছে। সেই একই জীবনতৃষ্ণা, *"কিছু বানিয়ে তোলার নেশায় মশগুল,"* পরাজয় অবধারিত তবু *"ভেঙে পড়েও বার বার উঠে দাঁড়ায়।"* এই বোধ শ্যামলের নাগরিক ইতিবৃত্তের স্নায়ুকেন্দ্রে।

লেখার রচনাকাল দেখলে জানা যায় গ্রাম সম্বন্ধে সব কিছু লেখার পর যে শ্যামল শহরে এসেছেন এমন নয় : গ্রাম নিয়ে দুটি কাহিনি লেখার পর শহর নিয়ে একটি কাহিনি, তার পর হয়তো দুটি গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করলেন। তবে এই দুই বৃত্তের লেখার মধ্যে একটা বড় তফাৎ চোখে পড়ে। প্রথম যুগের রচনা প্রাভাতিক সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, বসন্তের নবীনতা তার সর্ব অঙ্গে, স্টাইলে স্বতোৎসারিত নির্ঝরের অনায়াস গতি। ভালোবাসা, মানববেদনা, বিশ্বাসের এই জগৎ। সংঘাত বিরোধ ভাগ্যের অভিশাপ শেষ-পরাজয় সবই এ পৃথিবীতে আছে : তবু এ জীবনবোধ অস্তিবাচক : পরাজয়েরও বৃহত্তর সার্থকতার প্রতিশ্রুতি আছে। শহরের মাটি অনেক কঠিন, আকাশ কালো প্রত্যয়হীন। দিলীপ বসু শেষে জেনেছে প্রেমহীন এক রিক্ত পৃথিবীতে তার জীবন অসার্থক আশ্বাসহীন অপ্রাসঙ্গিক। কুবের মৃত্যুর আগে জেনেছে জ্যোৎস্না নীল, হলদে নয়। তার আফসোস রইল, এত বড় আবিষ্কার কাউকে সে জানাতে পারলো না!

মফঃস্বল শহর, পোড়ো বাড়ি, মরা জ্যোৎস্না, বর্ষার কালো মেঘ এসব ছেড়ে

কলকাতার জীবনে শ্যামল প্রথম দৃষ্টিপাত করলেন 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে। মানবিক সম্পর্কের জটিলতা গ্রামে কম নেই—রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথা আমাদের জানিয়েছেন। শহরজীবনে কি বিপুল বৈচিত্র্য, অর্থের ক্ষমতার লোভ সেখানে কত প্রবল, মানবিক সম্পর্কের মূল্য কত সীমিত। ...সেই শহর কলকাতায় নিবারণ সব সময় নিজেকে বিশ্লিষ্ট মনে করে। সে চায় সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হৃদ্যতা প্রাণের সম্পর্ক বজায় রাখতে কিন্তু সে জানে কারোর হৃদয়ে তার স্থান নেই। সে জানে বুকের দু ইঞ্চি নীচেই আত্মার নীলচে আলো জ্বলছে। কিন্তু হৃদয় খুঁড়ে সে বেশি দূর নামতে পারে না। সেই নিবারণ তার এককালের ফ্রেন্ড-গাইড-ফিলোসফার অনিলকে হোটেলে মত্ত অবস্থায় খুন করে ফেললে কেস আদালতে উঠল। গল্প আরম্ভ হয়েছে আদালতের কাঠগড়ায়—তারপর ফ্ল্যাশব্যাকে গল্পের কাহিনি চরিত্র ঘটনা সব হাজির কাঠগড়ার বাইরে। কাহিনি এমন কিছু জমাটবাঁধা নয়, নিবারণের একাকিত্ববোধ যা গল্পের হৃৎপিণ্ড তাও গভীরভাবে ভাবা হয়নি (গুণী বাঙালি ঔপন্যাসিকদের যে দোষটি প্রায় সার্বজনীন সম্পদের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে) এবং বিষয়ের ভেতরে গিয়ে মাথা না খুঁড়লে যা হয়, ভাসাভাসা চালাকচতুর একটি বাংলা উপন্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শহরজীবন নিয়ে এটা একটা হাত মকসো করা লেখা বলে মনে করলেই ভালো হয়। কোনো স্পষ্ট জীবনদর্শন দানা বাঁধেনি, কোনো বিশেষ চরিত্র টানে না, লেখক কোনো চরিত্রের প্রেমে পড়েননি। অপ্রয়োজনীয় লেখা, ছাপাবার কারণ সাহিত্যেতর। তবু এ গল্পের কটা জায়গায় অস্বাভাবিক ভালো বর্ণনা আছে ইস্পাত গলানোর ব্যাপারে।

সেই থেকে নিবারণ অনিলের কাছাকাছি। অনিলের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফারনেশ থেকে স্যাম্পেল নিয়েছে নিবারণ। সিলিকা প্লেটে তরল ইস্পাত ঢেলে দিয়ে ফুলকি দেখে বুঝতে শিখেছে—কতটা কারবন? কতটা ম্যাঙ্গানিজ?

সেই তাপ্তিমারা ওপেন হার্থ ফারনেসে তিরিশ টন ইস্পাত তরল হয়ে ফুটছে। গ্যাসপিট থেকে কারবন মনোক্সাইড এয়ার প্রেশারে মাটির নীচের ব্রিক চেম্বারে ঢুকে ত্রিগুণ গরম হয়ে ফারনেসে এসে ঢুকছে। এক একদিন ফারনেস ডোর তুলে নিবারণ স্ল্যাগ ঘেটে দেওয়ার সময় দেখেছে, কারবন মনোক্সাইড কীভাবে তরল ইস্পাতের ওপরে পড়ে নীলচে আগুনের জিভ দিয়ে স্ল্যাগ, আধপোড়া পিগ আয়রন, স্ক্র্যাপ গলিয়ে দিতে দিতে একঝাস্ট চেম্বারে ঢুকে পড়েছে। তখন একরকমের আনন্দ হোতো। এই বিপুল কাণ্ডকারখানায় শপাঁচেক লোক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ করে যায় বলেই—ডলোমাইট, লাইমস্টোন, পিগ আয়রন, স্ক্র্যাপ, কারবন, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, ফসফরাসের মাত্রা মাফিক মিশেল দিয়ে ছাঁটাই করে তরল ইস্পাত হয়— মোল্ড থেকে আনকোরা ইনগট করিয়ে আসে।

কলকাতা নিয়ে শ্যামলের দ্বিতীয় লেখা 'স্বর্গের পাশের বাড়ি'। এখানে তিনি

শহরের উচ্চাশা বৈচিত্র্য এবং জটিলতার কিছুটা পরিচয় দিতে পেরেছেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ গিরিশের কাহিনি নিয়ে গল্প আরম্ভ হল—তার ছেলে ভুদেব, ভূদেবের এক-গেলাসের ইয়ার এককালের বিখ্যাত সিনেমা ডিরেক্টর সুখেন, তার ভাই নবীন, নবীনের ছেলে গণেন, তার বাগদত্তা সরমা, ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর শ্রীনাথ আর গত যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী সুরেখা—এতগুলো লোকের জীবন চৌকো করে কেটে ফ্রেমে যেন পর পর আটকে রাখা হয়েছে। একই পরিচ্ছেদে দুটো কাহিনি কোনো ছেদ না দিয়ে লেখা হয়েছে। দু পরিচ্ছেদ বাদে একটা কাহিনির অংশ হয়ত আর এক অংশের সঙ্গে জড়িয়ে দেখা হলো। চার পাঁচটা জীবনের গল্প একই সঙ্গে বলার ফলে নগরজীবনের একটা কোলাজ গড়ে উঠেছে—এই অবধি বলা যায়। কিন্তু বিশেষ যে একটা থিম আছে তা মনে হয় না; তবে বোঝা যায় লেখক এখন পাকাপাকিভাবে গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন। কলকাতার সম্ভার এবং সম্ভাবনার বৃহৎ জগৎ লেখককে উত্তেজিত করেছে, মুগ্ধ করেছে তাঁকে একদা সফল এবং অধুনা বিধ্বস্ত জীবনের গল্প। বিষয় ভিন্ন হবার ফলে তাঁর বর্ণনভঙ্গি বা স্টাইল পাল্টে গেছে—অন্য ভঙ্গি অন্য শব্দ অন্য চিন্তা ব্যবহার করছেন। ভাষায় একধরনের মেদবর্জিত সরলতা এসেছে। প্রথম দিকের লেখায় পদে পদে আবেগ এবং উপমার আশ্রয় নিতেন লেখক, অপ্রত্যাশিত বিশেষণ বিশেষ করে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে পাঠকমনকে উত্তেজিত করতেন। স্টাইলে সেই তারুণ্য এবং উল্লাসের বদলে সাবধানী সংযত কেজো পদক্ষেপ এসেছে। 'স্বর্গের পাশের বাড়ি'তে ঘটনা এবং ব্যবহারিক জীবন সাদামাটাভাবে বলবার জন্য লেখক যেন নতুনভাবে হাত মকসো করছেন। এক অর্থে কলকাতা শহরটাই এই বইয়ের দ্বিতীয় নায়ক—ঘটনা, সংলাপ, বর্ণনা সবতাতেই একটা নাগরিক উদাসীনতার (অমনোযোগিতা নয়) ছাপ আছে। নাগরিক জীবনের যা অঙ্গাঙ্গী সেই নিস্পৃহতার গন্ধ আছে বাক্যগঠনে, শব্দ প্রয়োগে—বাচনক্রিয়া সংযত সাবধানী স্বরক্ষেপী। তবু মাঝে মাঝে জটিল ঘুর্ণমান কলকাতার জীবনে আকাশ দেখা যায় :

> সরমা গজাকে নিয়ে এইটিনথ ফ্লোরে উঠল। লিফট থেকে বেরিয়ে দুজনে গিয়ে ছাদে দাঁড়াল। কলকাতায় কত গাছ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একদম ক্যালেন্ডারের ছবি আঁকা বাড়ি। গঙ্গা একটা পরিষ্কার নদী। কলকাতা একখানা ঝকঝকে গ্রাম। সন্ধ্যার মুখে হাওড়া স্টেশন প্রায় বিয়েবাড়ি। শিয়ালদায় এখোনো আলো জ্বলেনি কেন? গড়িয়া বেহালা বারাসাতের দিকগুলি মেঘে মেঘে ঝাপসা। বোধয় খুব বৃষ্টি হচ্ছে ওসব দিকে।

এ ছবি প্রেমের ভালোবাসার। বোঝা যায় শ্যামল কলকাতার প্রেমে পড়েছেন। তিনি এখন একজন কলকাত্তাই নাগরিক।

শ্যামল এই যে শহরজীবনের কথা শুনিয়েছেন তাতে মনে হয় না তাঁর বিশেষ

কিছু বক্তব্য আছে—অর্থাৎ কোনো বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রকাশ নেই এতে। যেমন ছিল 'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' বা 'চন্দনেশ্বর জংশন'-এ। শ্যামল শহরজীবন দেখেই মুগ্ধ, তাঁর উত্তেজিত সৃষ্টিক্ষমতা এই জীবনের বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তি আবিষ্কার করেছে, শহরের জীবনের বিশিষ্টতা ঘটনার সহযোগে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু শহরের আত্মা এখনও অনাবিষ্কৃত। প্রথম যে বইটিতে শহরজীবনের আত্মার কাছাকাছি এলেন সেটি হলো 'অদ্য শেষ রজনী'। গ্রামের জীবন নিয়ে লিখে যে জগতের অস্তিত্ববাদ উন্মোচন করেছিলেন 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে, এখানে সেই জগতের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করার মতো—একটি গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কাহিনি এখানে বলা হয়েছে। বোধহয় বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। পরিশ্রমের ও অভিজ্ঞতার ছাপ আছে লেখায়। সেইসঙ্গে সার্ত্র যে কথা বলেছেন *"প্রতিটি জন্মে মৃত্যুর বীজ সুপ্ত থাকে"*—সেই ধীমান বাক্যের যেন একটি উদাহরণ এই বইয়ের গল্পটা। গ্রুপ থিয়েটারের মঞ্চে অমিয় নাটক করে *("তখনই ওর তাকানোর ভঙ্গি, মগ্ন মুখচ্ছবি বলে দেয় মৃত্যুবিষাদ ওর অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে")*। কিন্তু মঞ্চের পিছনে গ্রীনরুমে যে নাটক জমে তাতে অনেকগুলো জ্যান্ত মানুষের জীবন জড়িয়ে পড়ে। গ্রুপ থিয়েটার যখন সফলতার শীর্ষে পৌঁছয় তখনি শুরু হয় তার আত্মিক মৃত্যুর প্রাথমিক পেশীসংকোচ—সব সাফল্যের গর্ভেই মৃত্যুবীজ। মৃত্যুর ঘন্টা শুনতে পেয়েও যে পুরুষ বা রমণী তা উপেক্ষা করেন, মানবিক মর্যাদা রক্ষার জন্য শেষ অবধি জীবনের দাবি মেটান, আমরা সেই মানুষের ললাটে রাজটিকা দিই। যে বিশিষ্ট জীবনদর্শনে শ্যামলের লেখা ধনী সেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলো এখানে একটি মঞ্চের জীবন-সংগ্রামের কাহিনিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। পরাজয় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ও কাহিনির নায়ক নায়িকা—অমিয় এবং রজনী—শেষ অবধি এগিয়েছে, একজন মৃত্যুর সঙ্গে আর একজন ভাগ্যের সঙ্গে। জীবনের প্রতি এই বিস্মিত শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা শ্যামলের পৃথিবীর স্নায়ুকোষ বললেই হয়। থিয়েটার জগতের অব্যবস্থা সাফল্য হতাশা, ফ্লাড লাইটের সামনে যে মঞ্চ তার পিছনে যে সত্যি নাটক হয় সেকথা তিনি তো লিখেছেনই, উপরন্তু একটা নাটক মঞ্চে নামাবার পেছনে হল ভাড়া, সীন তৈরি, সেট তৈরি এসবের খুঁটিনাটি বাস্তব অবস্থা শাদা বাংলায় বলে গেছেন।

উইক ডেতে কোনো রিহার্সেল না থাকলে হাউজ একদম নিস্তব্ধ। সাজঘরে বিভিন্ন সিনের পোশাক আলাদা আলাদা র‍্যাকে ঝুলছে। বাইরের উঠোন মতো চাতালে সম্রাটের সেট তৈরির কাজ চলছে কদিন ধরে। কাঠের মিস্ত্রীরা সারাদিন কাজ করে র‍্যাঁদায় ঘষা কাঠের চোকলাগুলো এক কোণে জমা করে রেখে চলে গেছে। সম্রাটের সিংহাসনখানায় সবে রুপোলী রঙ চড়েছে। রঙ শুকিয়ে তা

এখন ঝক ঝক করছে। অন্যমনস্ক রজনী তাতে বসে ছিল। সাজা পানের খিলি খুলে জরদা ঢালতে যাবে রজনী—এমন সময় অমিয় সোজা উঠে এসে হাত চেপে ধরলো। জরদাগুলো খেয়েই গলার এমন অবস্থা করেছো। ফেলে দাও।

রজনী চোখ তুলে তাকালো। অমিয়র হাত থেকে পানসুদ্ধু নিজের হাতখানা ছাড়ানোর চেষ্টা না করেই আস্তে বললো, এই শেষ পানটা খেতে দাও।

সিনেমার জগৎ নিয়ে বাংলাভাষায় একাধিক গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। মঞ্চের জীবন, বিশেষ করে গ্রুপ থিয়েটারের কথা এমন করে বড় কেউ বলেননি। অথচ রঙ্গময়ী কলকাতার জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই পেশাদার কিম্বা অব্যবসায়ী experimental থিয়েটার গ্রুপের দলবল। প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি অনেক সময় গ্রুপ থিয়েটারের মৃত্যুদণ্ড। সাফল্য ক্রমশ পরীক্ষানিরীক্ষার দুঃসাহস কমিয়ে দেয়, আর্থিক সচ্ছলতা মানসিক স্বস্তি এবং অনড়তা আনে। সেই খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার বদ্ধ কারাগার থেকে কোনো কোনো গ্রুপ থিয়েটার সাহসে ভর করে নতুন experiment করে— ঠিক যেমন অমিয় তার "পঞ্চমুখ"-এ নিজেকে ভেঙে পদে পদে নতুন করে তুলতে চেয়েছিল। এ কাহিনি শ্যামলের জানা পৃথিবীর— অস্তিত্ববাদীর সেই সংগ্রাম, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তন প্রয়াস।

নগরের জীবন নিয়ে তিনখানা বই পড়া হলো : 'নির্বান্ধব', 'স্বর্গের পাশের বাড়ি', 'অদ্য শেষ রজনী'। এবার আসছি 'হাওয়াগাড়ি'তে। দুখণ্ডে প্রকাশিত সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে শহর কলকাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষী চাকুরে জীবনের বিচিত্র জটিলতার মাঝখানে এক পরিণত আধুনিক শহুরে কুবেরকে দেখতে পাই। যে বিচ্ছিন্নতাবোধের কথামাত্র আছে 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে। সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে দিলীপ বসুকে। এক উপন্যাস থেকে অন্য উপন্যাসে বিষয় ঘটনা ও চরিত্র টেনে যাওয়া শ্যামলের স্টাইল। এতে কয়েকটি উপন্যাসগুচ্ছের মধ্যে একটা একাত্মতা আসে। বালজাকের উপন্যাসে রাসটিগনাক, নাথান, ক্রেস্টিয়ান, ডিমারসে ভটিন বিয়াঙ্কা এইসব চরিত্র ঘুরে ঘুরে হিউম্যান কমেডির বিভিন্ন উপন্যাসে এসেছে। শ্যামলের উপন্যাসে অনেক সময় বিষয়ান্তর হলেও ভিন্ন নামে একই লোক আসে। কুবেরের স্বপ্ন, সে একটা কিছু গড়তে চায় *"অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, কোনো এক বিপন্ন বিস্ময়"*। হাওয়াগাড়িতে দেখি শহরজীবনের বিচিত্র শ্বাসরোধী ষড়যন্ত্র। একজন কর্মদক্ষ মানুষকে কাজের কোনো সুযোগ না দিয়ে হাসিমুখে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়ার মসৃণ ভয়ানক রাজনীতি; তাঁরই মধ্যে বসে দিলীপ কষ্ট পায় তাকে বন্ধু বলে প্রাণের সঙ্গে কেউ গ্রহণ করছে না। সে দেখে তার বিপুল কর্মক্ষমতা অফিসে অপচয় হচ্ছে। এই জগতের কথা শ্যামল বলেছেন প্রায় আবেগবর্জিত ভঙ্গিতে। কিন্তু যে মেজাজে কুবেরের বিষয় আশয় লেখা সেই প্রাণবন্ত মনের

খানিকটা আছে এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে, শহরজীবন সম্বন্ধে শ্যামলের সবচেয়ে পরিণত এই উপন্যাসে। 'হাওয়াগাড়ি' এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৃজনশীল জীবনের ধ্বংস আর অপচয়ের কাহিনি।

এই উপন্যাস পড়ে বারবার যত্নশীল পাঠকের 'কুবেরের বিষয় আশয়'-এর কথা মনে পড়বে। সেই বাঁধভাঙা সাহস, কর্মক্ষমতা, প্রায় না ভেবে বড় কাজের জোয়ারে নেমে পড়া। কিন্তু প্রথম উপন্যাসের জগৎ রৌদ্রস্নাত হাল্কা স্বপ্নিল মেজাজের, বিবৃতিতে ঘটনা রচনার পরিবেশে লেখার স্টাইলে তারুণ্যের স্বপ্ন টলটল করছে। 'হাওয়াগাড়ি'র জগৎ অন্য। শহরের ইটকাঠ, শেয়ার, দলিল, চাকরি, বোর্ডমিটিং, হোটেলের চিলিচিকেন, বাগানপার্টির বিলিতি হুইস্কি, টি গার্ডেনের সুইমিং পুল—সব কিছুতেই নগরের পরিচ্ছন্নতা এবং সফিস্টিকেশনের ছাপ। এখানে কিছুই অপ্রয়োজনে ঘটে না। এখানে বন্ধুত্বের সীমাও খুব স্পষ্ট। তার বন্ধুবান্ধব সকলেই ধনী, দু'চারজন লাখ লাখ টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কোল ইন্ডিয়ায় দিলীপের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এক বছরের মধ্যে একটা পড়ে থাকা কয়লার খাদানকে অবিশ্বাস্য পরিশ্রম আর কর্মক্ষমতায় সে চালু করে তোলে। অফিসের বোর্ডে কথা উঠল, পাণ্ডবেশ্বর অঞ্চলে এই নতুন ভৌমিক খাদান কে চালাচ্ছে! আর এক ধাপ ওঠার জন্য বন্ধুরা নির্দ্বিধায় দিলীপের নাম করলে। আসলে তারা দিলীপের বিপুল কর্মক্ষমতা দেখে ভয় পেয়ে গেল। ঠিক হলো দিলীপকে আর কাজ করতে দেয়া হবে না। *"ক্লিপ হিজ উইংস"*। ভৌমিক খাদানের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হ'য়ে গেল। এই সঙ্গে দিলীপের আর এক নতুন বাতিক দেখা গেল। পুরোনো মোটরগাড়ি কেনে, তার খোলনলচে পালটে তাকে নতুন করে, দিন কতক চালায় তারপর বেচে দেয়। কালু ঘোষ ছিল কলকাতা সমাজের মাথায়, সাতটা কোম্পানির ডিরেক্টর, তাকে দিলীপের নকশাল ছেলে রবি খুন করে। কালু ঘোষের কলকাতা-বিখ্যাত লাল অস্টিনট্যুরার গাড়ি দিলীপ কেনে। এ এক ভুতুড়ে গাড়ি। দিলীপ কোনো দিন গাড়ি চালায়নি—স্টিয়ারিং ধরামাত্র গাড়ি কলকাতার রাস্তায় দিব্যি চলে, এমন কি পেট্রল পর্যন্ত খরচ হয় না। এই গাড়ির কাহিনিতে শ্যামল একটি বিচিত্র ব্যাপার যোগ করলেন—পিছনের সিটে মৃত কালু ঘোষ অদৃশ্য হয়ে বসে রয়েছে, ডিরেকশান পরামর্শ সবই দিচ্ছে, শুনছে কেবল দিলীপ, অন্য কেউ সে কথা শুনতে পায় না। কল্পনা আর বাস্তবে মেশানো বিদ্‌ঘুটে লাল অস্টিনট্যুরার লেখকের উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দেয়। লেখক এখানে মর্ত্যজীবনের সঙ্গে আর একটি মাত্রা জুড়ে কাহিনিকে ঐশ্বর্যবান করেছেন। ঠিক যেমন মেদনমল্লর গড় ছিল কুবেরের কাহিনির একটি যাত্রা।

ইতিমধ্যে কোল ইন্ডিয়ায় দিলীপের চাকরি নিয়ে যখন গণ্ডগোল চলছে।

ঐশ্বর্য। এই লোকের যখন সব গেছে—ঘর বউ পুত্রকন্যা অর্থসম্মান প্রতিষ্ঠা—সে তখনও বলছে—

আমার মনে হয় কালুদা—আমি এখনো অনেক কিছু করতে পারি। আমার কেন যেন মনে হয়—আমি আবার নগর বসাতে পারি। বিশ্বাস করো কালুদা—আমি এখনো কিছু বানিয়ে তুলতে পারি—

আর নিজের আকাঙ্ক্ষা বলতে তার একটাই আছে—

তার সামনে এই রাস্তা তাকে পায়ে পায়ে সারা দুনিয়া এখন ঘুরিয়ে আনতে পারে। দিলীপ এই ঘোরার পথে তার হাওয়াগাড়িতে হর্নের জায়গায় একটা ঘন্টা বাঁধতে চেয়েছিল। সে ঘন্টা দমকলের। ঢং ঢং করে বাজবে। পেছনের সীটে কালুদা, সামনের সীটে চিড়িয়াখানার সেই জ্ঞানভিক্ষু হরিণ। যার গায়ে রোদ পড়ে পিছলে যাবে। অবুঝ সরল চোখে যে স্টীয়ারিং-য়ের পাশে বসে পৃথিবীর দিকে তাকাবে। সে সব কিছু হলো না আমার জীবনে।

কালু ঘোষের ভাঙা বসত বাড়িতে উঠে মাকড়সার জাল আর পেটাই ছাদের খসে পড়া টালি দেখতে দেখতে দিলীপের মনে হলো এসব তো তার চেনা জায়গা। ভীষণ পুরনো ভয়ঙ্কর চেনা। তবু সে ধরে উঠতে পারছে না। মেদনমল্লর দুর্গ দেখে কুবের এই ভাষাতেই ভেবেছিল। মলিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসে তার নজর পড়লো—

পাকা কুলগুলো পাখিদের ঠোঁটের ঠোকরে খুঁতো হয়ে নিচে পড়ে আছে। কয়েকটা যেখানেই মাটির সঙ্গ পেয়েছে সেখানেই সরু অঙ্কুর পাঠিয়ে দিয়ে গাছ হবার চেষ্টায় প্রাণপণ করে যাচ্ছে।

সব ধ্বংস মৃত্যুর পাশাপাশি জীবনের আশ্বাস। এই জীবনাসক্তি শ্যামলের পৃথিবীর শেষ কথা। তবু যে উজ্জ্বল প্রাণোন্মত্ত পৃথিবীতে কুবেরকে দেখেছি সে স্বপ্নিল তন্ময় পৃথিবী এখানে নেই। অনেক আশাভঙ্গের বাস্তব কঠিন মাটির পৃথিবী দিলীপের।

কুবেরের মৃত্যুতে সৌন্দর্য আছে। সে মৃত্যু বিষাদ প্রতিমা স্বরূপ। কিন্তু রানীর মৃত্যু—গর্ভবতী রানীর মৃত্যু—ভয়ানক। অদ্ভুত উদাসীনতা আর নিষ্ঠুরতার মিশেলে এই মৃত্যুর ছবি আঁকা হয়েছে। লেখকের কলমে কান্নার ছিঁটেফোঁটাও নেই। হয়তো সেই জন্যেই এত কঠিন মনে হয়। দিলীপকে রানী তাড়িয়ে দিয়েছে, কোন মুখে সে দিলীপের ঘর করবে। গর্ভপাতের জন্যে রানী কুইনাইনের বড়ি খেয়েছে—প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আলো আঁধারিতে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুক ফেঁটে যাচ্ছে তার—

এখুনি একটু জল চাই। তেষ্টায় জিভটা ছিঁড়ে পড়ছে। পারলে নিজেই মুখের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছিঁড়ে নেয় রানী। যে কোনো উপায়ে কয়েক ফোঁটা জল চাই। ঠিক এখুনি চাই অথচ দরজার ওপাশেই টোকাপানা ঢাকা এক পুকুর জল থির থির করে কাঁপছে।

খিড়কি খুলে বাইরে বেরিয়ে রানী আর দাঁড়াতে পারছিলো না। একটাও লোক নেই রাস্তায়। রানী দাঁড়াতে গিয়ে দেখলো সে আপনা আপনি পুকুরের ঘাটলার নাবিতে গড়িয়ে যাচ্ছে। জলে এত টান? আশ্চর্য। আগে তো কোনোদিন জানতাম না। একটা জঙলা ভাটোইয়ের শক্ত শেকড় ধরে

নিজের গড়ানোটা থামাতে গেল রানী। এইমাত্র একবার নাক থেঁতলে গেছে মাটিতে। তবু ব্যথা লাগেনি। আর একটা ভাটোইয়ের শেকড় ধরে ফেললো রানী। পারা যায় কি এ অবস্থায়। কিন্তু পেরে গেল। ভারী শরীরের গড়ানোর মেজাজ আটকাতে গিয়ে রানী তার নিজের ডান হাতখানা একদম দুমড়ে মুচড়ে ফেললো। সারা শরীরটা তখন ঘষটানো আর থ্যাঁতলানো। তার উপর রানীর মুখখানাও ভারী হয়ে এসেছিল। তাই এই নতুন ব্যথাটা আর সারা শরীরের মোট ব্যথার সঙ্গে যোগ হলো না। কারণ রানীর পুরোপুরি বিশ্বাস—সে আজ ভোর থেকেই স্বপ্নের ভেতর আছে। স্বপ্নে তো এমন কত কি হয়। ভাগ্যিস কষ্টে পড়ে জিভটা ছিঁড়ে ফেলেনি। তার চেয়ে বরং গলা ফাটিয়ে রবিকে ডাকি। রবি-রে-এ। আমি আর বাঁচবো না। নির্ঘাত মরে যাবো।

এই কঠিন নিরাসক্ত দৃষ্টি, এই খরতপ্ত আকাশ—একেই কি বলে জীবনবোধের পরিণত রূপ? আশা যেখানে স্তিমিত, প্রতীক্ষা ব্যর্থ, থরো থরো কম্পমান প্রত্যাশার পরিবর্তে অশেষ উদাসীনতায় জীবনের সব কিছু আঘাত মেনে নেওয়ার অহঙ্কার, হার নিশ্চিত জেনেও এক ধূসর পৃথিবীর বুকে শেষ অবধি একটা কিছু তৈরীর নেশায় মশগুল হয়ে থাকা? এও তো ট্র্যাজিক নায়কের লক্ষণ? আর ঘটনা মানুষ চরিত্র সব কিছুকে একটা নক্সায় বুনে তোলাই তো রূপকারের কাজ। অনেক ঘটনা অনেক চরিত্র অনেক কাহিনির মধ্যে একটা তাৎপর্য একটা জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দিলীপ ভাবছে শ্যামল বলছেন :

পৃথিবীর নিজের একটা মজা আছে। এখানে একই সঙ্গে নানা জায়গায় অনবরত নানা রকম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। খোলা চোখে মনে হবে একটার সঙ্গে আর একটার কোনো যোগ নেই। যে এইসব টুকরো টুকরো মনে মনে জুড়তে পারে—কিংবা এইসব অবিরাম কাণ্ডকারখানার ভেতর একটা যোগ দেখতে পায়—সেই শুধু এই পৃথিবীর মজা বোঝে। বলা যায়—সেই শুধু এই পৃথিবীর ভেতর আর একটা পৃথিবী দেখতে পায়।

শ্যামলের আগের রচনা হালকা তুলিতে ওয়াশের কাজ, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কয়েকটি এচিং-এর আঁচড়, ছাপছাপ কোলাজের বিভ্রমী বৈচিত্র্য। ছবি কিন্তু শাদাকালোর নয়। রঙীন জলরঙা মায়াবী। শুধু শেষের দিকের রচনায়—'হাওয়াগাড়ি', বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডে—তেলরঙের গম্ভীর ভারী অনুজ্জ্বল ভাব এসে গেছে। এসবে গোপাল ঘোষের প্রাণোচ্ছল লাল ফুলের বন্যা নেই, হলুদ সবুজ গাছ মাঠের তারুণ্য নেই; এখানে ফ্লেমিশ আর্টিস্টের চিন্তামগ্নতা এবং পর্যবেক্ষণের ভারী ছায়া প্রায় ওজন করা যায়। ভারী পাথর হালকা মনে ঠেলার একটা সময় আছে, পরে পাথর সরানো যায় তার ভার ভোলা যায় না। আমাদের অজান্তে ধীরে ধীরে সহজ স্টাইল এবং দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন এসেছে। কাহিনিতে কয়েকটা ঘটনা আর মূল জিনিসটা এত সহজে বলা হয়েছে তাতে বোঝা যায় লেখক বইটিকে ভালোবেসেছেন এবং ভালোবাসার যা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—হেলায় দুস্তর বাধা অতিক্রমের অমিত সাহস এবং প্রতিভা—তা লাভ করেছেন।

হালকা তুলিতে আঁকা ওয়াশের কাজ দেখুন। স্বৈরিণী আভা নিজেকে লোভনীয় করে তুলছে কুবেরের কাছে—একটানা দম না ফেলে বলে চলেছে—

বৃষ্টি থামতেই পাকুড়তলা থেকে একটু এগিয়েছি—বাঁ হাতেই ইঁটখোলার মাঠ জ্যোৎস্না পড়ে খাঁ খাঁ করছে, আমার যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে অনেকক্ষণ—ভীষণ জল খাওয়ার ইচ্ছে হলো। কোথায় যাই—একবার মনে হলো মেছুনিরা পোলো বসিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ, ভুল সময়ে এসে পড়েছি, একেবারে একা একা, এই মাঠে—কোথায় যাই, আচমকা নস্করদের পোড়ো বাগানে তাকিয়েছি—কি বলবো আপনাকে, ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা দুই গাছের ফাঁকে আকাশের সরু মতো গলিটা ধরে—চাঁদ একেবারে কদমপুরের মাথার উপর নেমে এসেছে, এই বড় চাঁদ, ঠিক এত বড়, বলতে বলতে আভার হাত দুখানা প্রায় বাতাস কাটতে শুরু করে দিল।

এত কাছে বলে স্পষ্ট দেখলাম চাঁদখানার ওপর অন্তত দুই ইঞ্চি পুরু করে নরম নীল মাখন লাগানো, অথচ চিরকাল জেনে এসেছি চাঁদ হলুদ রঙের—

শ্যামলের শেষের দিকের রচনায় কল্পনার দৌড় প্রায় সোজা রাস্তায়। স্টাইলের ঝকমকানি একরকম নেই বললেই হয়। হাওয়াগাড়ি নগরজীবনের অঙ্গ, নগরের গতি আনন্দ ঐশ্বর্যের প্রতীক। মাঝে মাঝে শ্যামল ভারী স্বরে প্রায় তেলরঙের ঘনগভীর ঢঙে কথা বলেন। চটুলতা সরলতা ক্ষিপ্রতার যে প্রসাদগুণ তাঁর আগের অনেক লেখায় আছে, এখানে তার চিহ্ন নেই—

সে তার মধ্যবয়সে জানতে পেরেছিল—এতকাল যাদের সে পাশের মানুষ, পাশের পৃথিবী বলে ভেবে এসেছিল, তার কিছুই তার পাশের নয়। কোনো জিনিসই হাত দিয়ে তেমন করে ধরা যায় না, নিজের মধ্যবয়সে পৌঁছে সে আবার নতুন করে ঐকিকের অঙ্ক কষেছে। বেশি বয়েসে অঙ্ক রাইট হলেও তাতে কোনো স্বাদ থাকে না। তবু জীবনের জন্য কত কি করে যেতেই হয়। কালুদা পাশাপাশি থাকতে থাকতে পৃথিবীটি এখন তার আরও পরিষ্কার লাগে।

চোখের তাকানো নরম করে আনলে দিলীপ। আমি এখন আর কাউকে ঘেন্না করি না রানী। সব মানুষের জীবনই খানিক খানিক করে ভুলে মেশানো। মানুষ তো নষ্ট হয় না কখনো। মাঝে মাঝে শুধু গোলমাল হয়ে যায় মানুষের। তাতে মানুষ ময়লাও হয় না।

লক্ষ করার কথা, এই স্বর শুধুমাত্র একটি ক্লান্ত মানুষের নয়, খুব বড় আঘাত পেলে মানুষ জীবন বিশ্বজগৎকে নতুন চোখে আবিষ্কার করে—বেদনাক্লিষ্ট চিন্তার সেই মাত্রা এবং গাম্ভীর্য আছে এতে। এমনকি হাওয়াগাড়ির প্রথম খণ্ডে ভাষার যে গতিশীলতা বা চটুলতা আছে দ্বিতীয় খণ্ডে দিলীপের জীবন যখন তিক্ততায় ভরে যাচ্ছে স্টাইলও সেই সঙ্গে ঋজু গাঢ় প্রকাশভঙ্গির দিকে যাচ্ছে। লেখক প্রায় এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিকের জায়গা নিচ্ছেন। শান্ত সুরে শ্রান্ত কণ্ঠে লেখক একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া জীবনের পাঁচালী পড়ছেন। এখানে ক্ষিপ্র উজ্জ্বল রচনার চেয়ে গভীর সুরের উপযোগিতা বেশি। শ্যামলের এই স্বরের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলুম না।

শ্যামলের কোনও উপন্যাস সুখের বা তৃপ্ত জীবনের কথা বলে না। তবু সব

দুঃখ দুর্দশা পরাজয়ের মধ্যেও আশার আলো ছিল আগের লেখায়। রিদয় নস্কর রেল পুলিশের বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছে—হাঁটতে পারে না দাঁড়াতে পারে না, বউটা বাড়ি বাড়ি ঝিবিত্তি করে মরে, ছেলেগুলো মাঠে মাঠে ধান কুড়িয়ে বেড়ায়—তবু রিদয় কোন সাহসে ভর করে এমাঠে ওমাঠে ঘেঁষটে ঘেঁষটে বেড়ায়। জিগেস করলে বলে, *"এই মাঠটা পেরোলেই যে আকাশখানা পড়ে তাতে সন্ধে সন্ধে চিত্তিরবিত্তির রঙ ফোটে। মনে নেয়—সামনে বুঝি কোনো ভাল দিন আসবে। এগিয়ে গে সেটা দেখি।"* এই আশাবাদী জীবন-চেতনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে নগরজীবনে এসে। শ্যামলের কলকাতা রুক্ষ কঠোর সীমাহীন অভিশাপে ধিকৃত। কুবেরের মৃত্যুমুহূর্ত এক কাব্যের সবুজ পৃথিবী, দিলীপের জীবন ও মৃত্যু এক তাপদগ্ধ পৃথিবীর নিঃসীম হাহাকার : 'হাওয়াগাড়ি'র শেষ কথা এই—

রবি ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়ে পোজিশন নিয়েছে। তার হাতের জিনিসের ডগায় সে এখন শুধু তার বাবাকেই দেখতে পাচ্ছে। মশালের আলো এইমাত্র বাতাসের থাপ্পড়ে উল্টোদিকে থেবড়ে গেল। এদিকে এখন ছায়া মতো। রবি এইরকমই চাইছিল।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠে কুবের পড়ে রইল, দিলীপের লাশ পড়ে রইল তারই তৈরি ধান ক্ষেতে। কিন্তু এ মৃত্যু ভয়াবহ। এই পরিকল্পিত হত্যার কোনো সান্ত্বনা নেই। পুত্র পিতাকে হত্যা করেছে ঠাণ্ডা মাথায়। কোনও ক্ষোভ কোনও দুঃখ নেই। আজন্ম নিঃসঙ্গ মানুষটা নিজের ঘোরেই জীবন কাটালে। হয়তো কাঁদবার জন্য রইল শেষ অবধি রবির ছেলে খোকন, আর দেহহীন কালুদা। সমস্ত বৈভবের শেষে, সব উৎসবের ক্ষান্তি রিক্ততায়—একথা শ্যামল বারবার বলতে চেয়েছেন। এক প্রবল এবং অনিঃশেষ বিস্ময়বোধ কুবের, খগেন, অমিয়, দিলীপ সবাইকে যেন আবিষ্ট করে রেখেছে। আর আছে অতি তীব্র বিষাদবোধ, মানব-বেদনা—যা আমাদের স্মরণ করায় প্রতি জন্মের গর্ভকোষে মৃত্যুর বীজ, প্রতি জয়ধ্বনিতে পরাজয়ের হতাশা, প্রতি উৎসবের শেষে নিষ্প্রদীপ অবসাদ। ঈশ্বর শ্যামলকে এক সবুজ পৃথিবী দান করেছিলেন, অনেক বেদনায় তিনি আমাদের নিয়ে এলেন এক রুক্ষ নিরীশ্বর প্রেমহীন অসার্থক জগতে। অক্লান্ত অন্বীক্ষায় এই জগৎ ধনী : তবু দুঃখ থেকে যায়, আপরাহ্নিক আলোয় মহত্তর এক বিশ্বচেতনার ইশারাই মাত্র থেকে যায়—মৃদু দ্বিধান্বিত কম্পিত। বিরাট বিশ্বের পটভূমি তাতে নেই। বিশ্বভুবনের পটভূমি না হলে তো মহাকাব্য রচিত হয় না। মহাকাব্যের ভ্রূণ ছিল এ সংগীতে; এ বাউলের, একতারার সংগীত, সহজিয়া সাধকের। অনুষঙ্গ ভরা শ্যামলের পৃথিবী তাই সীমিত।

বানান অপরিবর্তিত।

সান্ধ্যভাষা : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সম্মান সংখ্যা, বইমেলা, ১৯৯৮ প্রকাশিত।